সাধারণতঃ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া অঞ্চল বলে মনে করা হয়। কিন্তু কিন্তু ধর্মপালের খালিমপুর লিপি এবং দেবপালের নালন্দা লিপিতে উল্লিখিত ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল বা বাগড়ী এখনকার প্রেসিডেন্সী বিভাগ বলেও অনেকে মনে করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর পূর্বদিকের অঞ্চল এখনও বাগড়ী নামেই পরিচিত। যাই হোক তাঁর রাজ্য যে সমগ্র বাংলা এবং উত্তর বিহারে পরিব্যপ্ত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লালসেন চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জগদেবমল্লের কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন। শেষ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে ত্রিবেনীর নিকট নিরঞ্জন পুরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বাস করেন অথবা সঙ্গমে আত্মবিসর্জন করেন।

লক্ষ্মণসেন ঃ বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৭৯- ১২০৫) যখন রাজা হন তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর। তিনি অল্প বয়সেই পিতামহ বিজয়সেনের সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করে নানা যুদ্ধে রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পিতা বল্লালসেনের সময়েও তিনি নানা যুদ্ধে তাঁকে সাহায্য করেন। তিনিই প্রকৃতপ(গৌড়রাজ মদনপালকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন। কারণ বিজয়সেন বা বল্লালসেন গৌড় আত্র(মণ করলেও এবং যুদ্ধে জয়লাভ করলেও তাঁর তাম্রশাসনেই প্রথম সেনরাজারা গৌড়ে(র রূপে অভিহিত হয়েছেন। কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন এবং কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় তাঁর সমরকুশলতার প্রমাণ। উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ এবং দ(ণে কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করে তিনি নিজ রাজ্যকে সুদৃঢ় করেন। সম্ভবতঃ গৌড় বিজয়ের পর তাঁর নামেই রাজধানী ল(ণাবতীর নামকরণ হয়েছিল। সারা জীবন যুদ্ধ বিগ্রহে অতিবাহিত করলেও লক্ষ্মণসেন শাস্ত্র এবং ধর্মচর্চায়ও কম দ(ছিলেন না। তিনি পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণসেন নিজে কবি ছিলেন এবং জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি ধর, গোবর্ধন প্রভৃতি কবিগণ তাঁর সভাসদ ছিলেন।

কিন্তু এত শক্তি(এবং গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজ্য-আত্র(মণকারী মুসলমান অভিযাত্রী বখ্‌ত-ইয়ার খিলজিকে প্রতিহত করতে পারেন নি। তাঁর সময়েই বাংলা তুর্কী সেনাপতি বখ্‌তইয়ার খিলজি দ্বারা আত্র(ান্ত এবং অধিকৃত হয়। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন সেই সময় নবদ্বীপে ছিলেন। তুর্কীবিজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে তাঁর বহু সভাসদ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তি(নবদ্বীপ ত্যাগ করলেও তিনি তাঁদের সঙ্গে আগেই নবদ্বীপ ত্যাগ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে অতর্কিত আত্র(মণে হতচকিত রাজা শেষ পর্যন্ত নি(পায় হয়ে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তাঁদের অন্যতম রাজধানী বিত্র(মপুরে গমন করেন। মুসলমান বাহিনী নবদ্বীপ অধিকার করে লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে ধাবিত হয়।

গৌড় - লক্ষ্মণাবতী বখ্‌ত-ইয়ার কর্তৃক অধিকৃত হলেও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর রাঢ়ের কিছু অংশ এবং বরেন্দ্রের এক অংশ ছাড়া সমগ্র বঙ্গদেশ বখ্‌ত-ইয়ারের অধিকারের বাইরে ছিল। সুতরাং এর পরও লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর বংশধরেরা অন্ততঃ ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আনুমানিক ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় বি(রূপসেন ও কেশবসেন পূর্ব ও দ(ণবঙ্গে রাজত্ব করেন। সুতরাং মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল মুসলমান অধিকারে গেলেও বাগড়ী অঞ্চল আরও অনেকদিন সেনদেরই অধিকারে ছিল।

সেন আমলে শাসনব্যবস্থা ঃ পাল আমলে যেমন কেন্দ্রীয় শাসনের পাশাপাশি সামন্তরাও প্রায় স্বাধীনভাবে আপন আপন অঞ্চল শাসন করতেন সেন আমলে কিন্তু তা ছিল না। এ আমলে শাসনব্যবস্থা গুপ্তদের মত কেন্দ্রীভূত ছিল এবং দেশকে বিভিন্ন ভুক্তি(, মণ্ডল, বীথি প্রভৃতি অঞ্চলে ভাগ করে কেন্দ্রের অধীনে কেন্দ্রের প্রতিভূরূপে ভূক্তি(পতি, মাণ্ডলিক, বীথিপতি প্রভৃতির দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হত, যদিও অবশ্য শেষদিকে এই কেন্দ্রীভূত শাসন বহু(ত্রেই শিথিল হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রাজপ্রতিভূগণ সুযোগ সুবিধা বুঝে নিজ অঞ্চলে প্রভুত্ব করতে থাকেন।

সেন আমলে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা সম্ভবতঃ প্রথমে দুটি ভুক্তি(র অন্তর্গত ছিল। রাঢ় অঞ্চল বর্ধমান ভুক্তি(এবং বাগড়ী বা ব্যাঘ্রতটী মণ্ডল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি(র অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে অন্ততঃ লক্ষ্মণসেনের আমলে বর্ধমান ভুক্তি(কে ভেঙ্গে আরও একটি ভুক্তি(গঠন করা হয়। সেটি কঙ্কগ্রাম ভুক্তি(। বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে (আঃ ১১৬৯ - ৭০ খ্রীষ্টাব্দ) বর্ধমান ভুক্তি(র অন্তর্গত উত্তর রাঢ় মণ্ডলের স্বল্পদ(ণবীথির গ্রামগুলি বর্তমান গঙ্গাটিকুরির (বর্ধমান জেলা) নিকটে কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার ভরতপুর (বর্তমান সালার) থানার অন্তর্গত। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শক্তি(পুর তাম্রশাসনে (আঃ ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লিখিত কঙ্কগ্রাম ভুক্তি(তে মধুগিরি মণ্ডলের দ(ণবীথির অন্তর্গত স্থানগুলি ভরতপুরের পা(বর্তী বড়এ(া থানার পাঁচথুপি সংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত।

কঙ্কগ্রাম ঃ কঙ্কগ্রামকে অনেকেই একালের কাগ্রাম বলে মনে করেন। সেটা হয়ত ঠিক। তবে সেকালের কঙ্কগ্রামের অবস্থান

সম্ভবতঃ এখনকার কাগ্রামে ছিল না, আর একটু পশ্চিমে এখন যেখানে সালার, সেখানে ছিল। কারণ কাগ্রামে প্রাচীনকালের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু কাগ্রামের নিকটবর্তী সালারে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক নিদর্শন দেখা যায়। এখানে 'দহপুষ্করিনী'তে বেশ কয়েকটি বিষ্ণু ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং মন্দিরের স্তম্ভ গাত্রে খোদিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও অনেক বিষ্ণুমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পুষ্করিনী - সংলগ্ন উঁচু ঢিপিটি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যায় সেটি একটি প্রাসাদ অথবা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। জনশ্রুতি, এই স্থানে রাজা শালিবাহনের রাজধানী ছিল। শালিবাহনের ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না, এটা কি পূর্বতন সেন রাজাদের কারও রাজধানী ছিল? যাইহোক এই অঞ্চলে যে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় বৌদ্ধ পাল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনযুগে এই অঞ্চল অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

ধর্ম ঃ পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু সেন রাজগণ গোঁড়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের আগে পর্যন্ত সেনরাজারা ছিলেন শৈব। তাঁরা পরম মাহেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করেছেন। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বৌদ্ধ বিহারাদি এবং বৌদ্ধ জনগণ অবহেলিত হয়। রাজ্যশাসন কেন্দ্রীভূত হওয়ায় প্রজা সাধারণের উপর নিজ ধর্মমত চাপিয়ে দেওয়াও তাদের পক্ষে অনেক সহজ ছিল। যাই হোক মুর্শিদাবাদের সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে এই যুগের বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বিশেষতঃ বিষ্ণুমূর্তি এবং দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যাপক প্রচলনের অকাট্য প্রমাণ।

মধ্যযুগ ঃ সুলতানী আমল

বাংলায় মুসলমান আক্রমণ ও অধিকার ঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের একেবারে শেষ দিকে তুর্কী অভিযানকারী মালিক ইখ্‌ত-ইয়ার উদ্‌-দীন মহম্মদ বখ্‌ত-ইয়ার খিলজি অতর্কিত আক্রমণে নবদ্বীপ অধিকার করেন। লক্ষ্মণসেন সেই সময় নবদ্বীপেই অবস্থান করছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে বখ্‌ত-ইয়ারের নবদ্বীপ বিজয় এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ইতিহাসেও এই ঘটনায় যুগান্তরের সূচনা হয়। এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন মৌলনা মিনহাজ উদ্দীন (মিনহাজ্‌-উদ্‌ দীন-সিরাজ), ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছরে পরে (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিত তাঁর 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' গ্রন্থে। মহম্মদ বখ্‌ত-ইয়ার বিহার প্রদেশের বিভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সেই অর্থে বিরাট সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হন। তারপর আকস্মিক আক্রমণে 'বিহার' দুর্গ অধিকার ও লুণ্ঠন করেন এবং দুর্গস্থ সকল অধিবাসীকে হত্যা করেন। এটা অবশ্য দুর্গ নয়, এটি ছিল বিখ্যাত 'ওদন্তপুরী' বিহার। যাঁদের হত্যা করা হয় তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ। এক বৎসর পর ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আবার বিহার আক্রমণ করেন এবং সেখানে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এবার 'বিক্রমশিলা' বিহার ধ্বংস হয়।

বিহার ধ্বংস এবং মগধ জয়ের সংবাদ নদীয়ায় (নবদ্বীপে) রাজা লক্ষ্মণসেনের ('রায় লখমনিয়া') কর্মচারীদের কাছে পৌঁছালে নগর রক্ষার ব্যবস্থা করা তো হ'লই না বরং রাজ্যের মন্ত্রিবর্গ, জ্যোতিষীগণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ লক্ষ্মণসেনকে তুর্কী অভিযাত্রীদের বাধা না দিয়ে দেশত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। কারণ শাস্ত্রে নাকি লিখিত আছে এই দেশ তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হবে। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বণিক এবং উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষ পূর্ববঙ্গ ও আসামে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেননি। এক বছর পর (১২০১ খ্রীষ্টাব্দ) বখ্‌ত-ইয়ার বিহারশরিফ থেকে গয়া ও গভীর জঙ্গলময় ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে নবদ্বীপ অভিযান করেন। মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বিনা বাধায় তিনি নবদ্বীপ অধিকার করেন। হতচকিত বিভ্রান্ত রাজা উপায়ন্তর না দেখে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে গমন করেন। লক্ষ্মণাবতী রক্ষার চেষ্টা করা তাঁর উচিত ছিল, কিন্তু নিরুপায় রাজা সে চেষ্টা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি।

মিনহাজ উদ্‌দীনের এই 'রূপকথা' অনেকেই বিশ্বাস করেন না। মিনহাজ পঞ্চাশ বছর পর এই ঘটনার বিবরণ গৌড়ের দুই সৈনিকের নিকট জানতে পারেন। সুতরাং এই ঘটনার সত্যতায় বিশ্বাস করা কঠিন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করেন নি। (বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। রমেশচন্দ্র মজুমদারও মিনহাজের সব কথা সত্য বলে বিশ্বাস করেন নি। (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড)। নীহার রঞ্জন রায় এই বিবরণ সত্য বলে মনে করেন (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব) এবং

আচার্য যদুনাথ সরকার মিনহাজের গ্রন্থকে আদি এবং শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন (হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা বি(বিদ্যালয়)। উভয়েই এই ঘটনার ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য কারণগুলি বি(-ষণ করে দেখিয়েছেন, এই ঘটনার মূল বিবরণ বি(বাস না করার কোন কারণ নাই।

আচার্য যদুনাথ এক কথায় বলেছেন, বিহার আত্র(মণ এবং অধিকারের সময় লক্ষ্মণসেন ঔদাসীন্যে ঘুমাচ্ছিলেন ('Slumbering in apathy'-ঐ পৃঃ-৯)। আর নীহাররঞ্জন রায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক কারণ আলোচনা করে দেখিয়েছেন, ঐ অবস্থায় এই পরিণতিই স্বাভাবিক। 'আসলে ব্যাপার এই যে, যেখানে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত ও পলায়মান, উপদেষ্টা ও মন্ত্রীবর্গ পরাজয়ী মনোবৃত্তি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং জ্যোতিষ যেখানে রাষ্ট্রবুদ্ধির নিয়ামক সেখানে সৈন্যদলের ও জনসাধারণের প্রতিরোধ দুর্বল হইতে বাধ্য। মিনহাজের বিবরণী পড়িয়া মনে হয়, বখ্ত ইয়ার যে একেবারে বিনা বাধায় বিহার ও বাঙলাদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা এই কারণেই।' (ঐ পৃঃ ৪৯৭)। এছাড়াও আরও একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'পালবংশ মুখ্যত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, সেনবংশ গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী' (ঐ পৃঃ ৫০০)। তিনি দেখিয়েছেন, এই আমলে বৌদ্ধদের প্রতি অবহেলা ও অবিচার এবং সর্বোপরি বৌদ্ধদের সমাজের ব্রাত্য করে রাখার জন্য উগ্র ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনরাজারা বৌদ্ধদের বি(ব্ধ ও বিরূপ করে তুলেছিলেন। সমাজের উচ্চতম স্তর ব্যতীত সর্বস্তরের মানুষ, যাঁরা পাল আমলে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন তাঁদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার (এবং অত্যাচারও) তাঁদের রাষ্ট্রবিরোধী করে তুলেছিল। এমন কি এই সমাজের ব্রাত্য বৌদ্ধ জনগণ ব্রাহ্মণ্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ কামনায় হয়ত মুসলমানদের সাহায্যও করেছিলেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক 'তারনাথের বিবরণী হইতে মনে হয়, এক দল বৌদ্ধ ভি(মহম্মদ বখ্ত-ইয়ারের গুপ্তচরের কাজ করিয়াছিলেন এবং বাংলার সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছিলেন।' (ঐ ৫১১ পৃঃ)

বখ্ত-ইয়ারের লক্ষ্মণাবতী অধিকার ঃ নবদ্বীপ অধিকারের পর কয়েকদিন নগরে লুণ্ঠন এবং ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর বখ্ত-ইয়ারের বাহিনী রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর (বর্তমান মালদহ জেলায় গৌড়ের সংলগ্ন নগর) দিকে ধাবিত হয়। সেই সময় গৌড় নগর গঙ্গার পশ্চিম তীরে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের দিকেই অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতক পর্যন্ত গঙ্গার এই প্রবাহই বর্তমান ছিল এবং সপ্তদশ শতকে গঙ্গা বর্তমান প্রবাহ অবলম্বন করে। এই বিষয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬-৯৪)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণাবতী যেতে হলে দ(িণ থেকে উত্তর দিকে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাকেই অতিত্র(ম করতে হয়। পথে সর্বত্র লুণ্ঠন এবং ধ্বংসলীলা চলে। এর বহু নিদর্শন মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক স্থানেই ছড়িয়ে আছে।

গৌড়-লক্ষ্মণাবতী ঠিক কবে এবং কিভাবে অধিকৃত হয়েছিল তার কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে নবদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বখ্ত-ইয়ার ল(্মণাবতী (মুসলমান ঐতিহাসিকগণের রচনায় 'ল(্মৌতি') অধিকার করেন তা ধরে নেওয়া যায়। ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাঁর গৌড় অধিকারের সময় সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও তিনি ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই যে গৌড় সমেত বরেন্দ্র অধিকার করেন তা বলা যায় (হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড, পাটনা, ১৯৭৩, পৃঃ ৮-৯)

লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কিছুদিন পর বখ্ত-ইয়ার তাঁর বি(স্ত সঙ্গী ও সেনাপতি মহম্মদ শিরাণ ও তাঁর ভাই আহমেদ শিরাণকে যথাত্র(মে লখ্নৌর (বীরভূম জেলায় নগর বা রাজনগর) ও উড়িষ্যার জাজনগরে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার দ(িণ অঞ্চলে হিন্দুদের ব্যস্ত রাখা এবং রাঢ় অঞ্চল পাকাপাকি ভাবে দখল করা। লখ্নৌর অধিকৃত হয়। তবে সমগ্র বাংলা নয়, বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ এবং গঙ্গার দ(িণে রাঢ় দেশের উত্তরাংশ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ এবং বীরভূম জেলার কিয়দংশ) তাঁর অধিকারে আসে। বর্তমান বীরভূম জেলার রাজনগর বা নগর (লখ্নৌর') ছিল তাঁর অধিকারের পশ্চিম সীমা। তবে লক্ষ্মণাবতী নয় বখ্ত-ইয়ারের শাসনকেন্দ্র ছিল বর্তমান দ(িণ দিনাজপুর জেলায় দেবকোট বা দেবীকোট (বর্তমান গঙ্গারামপুর)।

গৌড় ল(্মণাবতী অধিকারের পর দুবছর বখ্ত-ইয়ার তাঁর অধিকৃত অঞ্চলটিকে দৃঢ় শাসনাধীনে আনয়নে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর অধিকৃত অঞ্চল কয়েকটি অংশে ভাগ করে তিনি তাঁর বি(স্ত সঙ্গীদের সেই সব অঞ্চল শাসনের ভার দিয়েছিলেন। উত্তরাঞ্চলে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন আলি মর্দান, লখ্নৌর বা পশ্চিমাঞ্চলে মহম্মদ শিরাণ এবং গাঙ্গুরীতে (বর্তমান গণকর) হাসান অথবা হুসাম-উদ্-দিন ইউয়জ। বলা বাহুল্য এরা সকলেই ছিলেন তুর্কী অথবা খিলজি (রমেশচন্দ্র মজুমদার, হিস্ট্রি অব্ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল, পৃঃ ২)।

বখ্‌ত-ইয়ারের ব্যর্থ তিব্বত অভিযান ও মৃত্যু ঃ লক্ষ্মণাবতী অভিযানের দু-বছর পর বখ্‌ত-ইয়ার তিব্বত অভিযান করেন। কিন্তু অভিযান কেবল ব্যর্থই হয়নি, তুর্কী সেনাপতির উপর বিপর্যয় নেমে আসে। বিধ্বস্ত বাহিনীর অবশিষ্টাংশ নিয়ে তিনি ভগ্নহৃদয়ে কোন মতে দেবকোট ফিরে আসেন। সেখানে তিনি গু(তর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর মৃত্যু হয় (১২০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দ)। মতান্তরে তিনি তাঁর বি(স্ত সহচর আলি মর্দান কর্তৃক নিহত হন।

আলি মর্দান ঃ বখ্‌ত-ইয়ারের মৃত্যুর পর মহম্মদ শিরাণ দেবকোট আত্র(মণ ও অধিকার করেন। আলি মর্দানকে বন্দী করে তিনি নিজেকে বখ্‌ত-ইয়ারের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আলি মর্দান কারাগার থেকে পলায়ন করে দিল্লীর বাদশাহ কুতুব্‌-উদ্‌-দীন আইবেকের শরণাপন্ন হন। কুতুব্‌-উদ্‌-দীন সেনাপতি কায়েমাস (মিকে দেবকোট পাঠান। সেখানে হুসাম্‌-উদ্‌-দীন ইউয়জ তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। কায়েমাস শিরাণকে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে হুসাম্‌-উদ্‌-দীনকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে দিল্লী ফিরে যান। আলি মর্দান এই সময় দিল্লীতে ছিলেন। কুতুব-উদ্‌-দীন তাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত(করেন। হুসাম-উদ্‌-দীন এতদিন সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করেছিলেন, কিন্তু তিনি আলি মর্দানকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করেন।

আলি মর্দান (১২১০-১৩) আলা-উদ্‌-দীন নাম গ্রহণ করে শাসনকর্তা হয়ে বসেন। তাঁর সময়ে উত্তর রাঢ় তাঁর অধিকারে ছিল। (H. B. Vol. II, P : 20) তিনি অত্যাচারী শাসক ছিলেন, সেইজন্য খিলজি আমীরগণ তাঁকে হত্যা করে হুসাম-উদ্‌-দীনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত(করেন।

গিয়াস্‌-উদ্‌-দীন ইউয়জ খিলজি (১২১৩-২৭) ঃ- গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে হুসাম-উদ্‌-দীন ইউয়জ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গাঙ্গুরীর (বর্তমান গণকর, জঙ্গীপুর মহকুমা) জায়গীরদার এবং বখ্‌ত-ইয়ারের অধীনে আঞ্চলিক শাসনকর্তা ছিলেন। শিরাণের পর সম্রাট কুতুব্‌-উদ্‌-দীনের সেনাপতি কায়েমাস তাঁকে সাময়িকভাবে রাজ্যশাসনের ভার দেন, এবং সেই সময় তিনি সম্ভবতঃ গাঙ্গুরী থেকেই শাসনকার্য চালিয়ে যান। পরে আলি মর্দানের পর তিনি খিলজি ওমরাহদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে লখ্‌নৌতির সুলতানরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং গিয়াস-উদ্‌-দীন খিলজি নাম গ্রহণ করেন। দেবকোট থেকে রাজধানী বা শাসনকেন্দ্র তিনি লখ্‌নৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। এর পর দীর্ঘকাল গৌড়-লখ্‌নৌতিই বাংলার সুলতানদের রাজধানী রূপে পরিগণিত হয়।

গিয়াস-উদ্‌-দীন ইউয়জ পনের বৎসর গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল অবশ্যই তাঁর অধিকারে ছিল কিন্তু বাগড়ী অঞ্চল তখন পূর্ববঙ্গের সেনরাজারা বিত্র(মপুর থেকেই শাসন করতেন। তাঁর সময়ে রাজ্যে সুশাসন ছিল। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক এবং দয়াবান নরপতি। বিদ্বান, ফকির এবং সৈয়দদের তিনি অনেক বৃত্তি দিয়েছিলেন। তিনি রাজ্যে অনেক মসজিদ এবং মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি দেবকোট থেকে লখ্‌নৌর পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ। এই পথের নিদর্শন এখনও বর্তমান। তাঁর সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা দ(িণবঙ্গ আত্র(মণ করে কিছুটা অধিকারও করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন (১২১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। গিয়াস্‌-উদ্‌-দীনের সঙ্গে দিল্লীর সুলতান ইলতুৎমিসের বিবাদ হয় এবং সংঘর্ষে তিনি পরাজিত হন এবং লখ্‌নৌতি অধিকৃত হয়। বহু ধনরত্নাদি উপঢৌকন দিয়ে তিনি সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন (১২১৫)। কিন্তু ইলতুৎমিসের সঙ্গে তাঁর পুনরায় সংঘর্ষ হয় এবং যুদ্ধে তিনি বন্দী ও নিহত হন।

গিয়াস্‌-উদ্‌-দীন গাঙ্গুরীর জায়গীরদার এবং সীমান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর সময়েই সম্ভবতঃ মহীপালনগরের সীমানায় গিয়াসাবাদ নগরের (সাগরদীঘি থানা, গণকরের প্রায় ২০ কি. মি. দ(িণে) পত্তন হয়। ঊনিশ শতক পর্যন্ত গিয়াসাবাদ ঐ অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট স্থানরূপে পরিগণিত ছিল এবং সেখানে সাগরদীঘি থানার কার্যালয়ও অবস্থিত ছিল। সেখানে একটি সুন্দর দরগা এখনও বর্তমান। দরগাটি গিয়াস্‌-উদ্‌-দীন নামে এক পীর বা ফকিরের সমাধিস্থল। দরগাটির নির্মাণে পাথরের থাম ও অন্যান্য মাল-মসলা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ মহীপাল নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই এগুলি সংগৃহীত হয়েছে। বখ্‌ত-ইয়ারের ল(্মণাবতী অভিযানের পথে মহীপাল নগর তুর্কী-সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখনও ঐ অঞ্চলে এক কালের ব্যাপক ধ্বংসলীলার পর্যাপ্ত নিদর্শন পাওয়া যায়।

গিয়াস্‌-উদ্‌-দীনের পরবর্তী শাসকগণ ঃ গিয়াস্‌-উদ্‌-দীনের মৃত্যুর পর লখ্‌নৌতি রাজ্য আবার দিল্লীর সুলতানের অধীনস্থ হয় এবং দিল্লীর প্রেরিত শাসনকর্তাদের দ্বারাই এই রাজ্য শাসিত হয়। এমনই একজন শাসনকর্তা তুঘরাল তুঘান খাঁ (১২৩৬-৪৫)। তাঁর আমলে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রথম নরসিংহদেব লখ্‌নৌতি আত্র(মণ করেন। তুঘরাল ঐ আত্র(মণ প্রতিহত করেন। কিন্তু তিনি উড়িষ্যায় প্রতি আত্র(মণ করতে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হন। উড়িষ্যার রাজা আবার বাংলা আত্র(মণ করেন

এবং লখ্নৌর অধিকার করে লখ্নৌতির দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু দিল্লী থেকে বাদশাহের সেনাপতি তামার খাঁন পৌঁছে যাওয়ায় লখ্নৌতি র(া পায়। তবে তামার খান তুঘরালকে রাজ্যচ্যুত করে নিজেই লখ্নৌতির অধিকার নেন। এরপর লখ্নৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত(হন মালিক ইখ্ত-ইয়ার-উদ্-দীন উজবেক তুঘরাল খাঁ। তাঁর সময়ে উড়িষ্যার সঙ্গে কয়েকবার সংঘর্ষ হয় এবং তৃতীয় বারে ইখ্ত-ইয়ার-উদ্-দীন ভয়ানক ভাবে পযুর্দস্ত হন। অবশ্য তিনি মান্দারণে (হুগলী জেলা) উড়িষ্যার শাসনকর্তাকে পরাস্ত করে সহজেই মান্দারণ অধিকার করেন।

বখ্ত-ইয়ার নদীয়া অধিকার করলেও পরে নদীয়া লখ্নৌতির হস্তচ্যুত হয়েছিল। ইখ্ত-ইয়ার নদীয়া পুনরাধিকার করেন। ইখ্ত ইয়ার মঘিস্-উদ্-দীন নাম গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১২৫৫)। কিন্তু তাঁর বি(দ্ধে দিল্লীর বাহিনী অগ্রসর হলে তিনি পশ্চাদপসারণ করতে বাধ্য হন। এতেও তিনি শি(াগ্রহণ না করে কামরূপ অভিযান করেন, এবং সেখানেই তনি বন্দী এবং নিহত হন (১২৪৭)।

১২৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরি ৬৫৭) বিহারের কারা প্রদেশের শাসনকর্তা তাজ-উদ্-দীন্ আরসালান খাঁ লখ্নৌতি আত্র(মণ ও অধিকার করেন এবং ১২৬৫ পর্যন্ত লখ্নৌতি স্বাধীনভাবে শাসন করেন। বাংলার একটি বিশাল অংশ তিনি নিজ রাজ্যভুক্ত(করেন। এ যাবৎ মুর্শিদাবাদ জেলার বাগড়ী অঞ্চল পূর্ববঙ্গের সেন রাজাদের শাসনাধীনেই ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে বাগড়ী অঞ্চলও অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ জেলার সবটাই লখ্নৌতির শাসনাধীনে আসে। ইতিমধ্যে সেনরাজাদের রাজ্যের অবশিষ্ট অংশও চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) রাজা দনুজমাধব রায় অধিকার করেন। এইভাবে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে।

তুঘরাল খাঁ ঃ ১২৭১ নাগাদ দিল্লীর সুলতান বলবন আমিন খাঁকে লখ্নৌতির শাসনকর্তা এবং তুঘরাল খাঁকে তাঁর সহকারীরূপে নিযুক্ত(করেন। তবে প্রকৃতপ(ে তুঘরালই সর্বেসর্বা হয়ে বসেন। তুঘরাল সোনারগাঁয়ের (ঢাকা) কাছে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া উড়িষ্যার অধিকৃত দ(িণ রাঢ় অধিকার করে উড়িষ্যায় অভিযান করেন এবং সে দেশ থেকে বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে আনেন। উড়িষ্যা থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তুঘরাল দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করেন। মুঘিস্-উদ্-দীন নাম গ্রহণ করে তুঘরাল নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তুঘরাল বাংলায় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। এমন কি দিল্লীর সুলতান বলবনের অনেক পদস্থ ব্যক্তি(ও তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণায় সম্রাট বলবন তাঁর বি(দ্ধে সামরিক অভিযান পাঠান। কিন্তু তাতে তেমন কাজ না হলে স্বয়ং তাঁর বি(দ্ধে অভিযান করেন। শেষ পর্যন্ত তুঘরাল পরাজিত ও নিহত হন। বলবন তারপর স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খাঁকে শাসনকর্তা নিযুক্ত(করে দিল্লী ফিরে যান।

নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ ঃ বুঘরা খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করে নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্ নাম গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তিনি অলস প্রকৃতির এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর (বুঘরা খাঁর) পুত্র কায়কোবাদ দিল্লীর সুলতান হন। পিতা-পুত্রে প্রথমে সংঘর্ষ হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের পুনর্মিলন হয় এবং পুত্র দিল্লীতে এবং পিতা লখ্নৌতিতে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু পুত্র কায়কোবাদ সেনাপতি জালাল-উদ্-দীন খিলজি কর্তৃক নিহত হলে তিনি সম্ভবতঃ মর্মাহত হয়ে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র (ক্ন-উদ-্দীন কায়কাউস বাংলার সিংহাসনে বসেন।

সামস্-উদ্-দীন ফি(জ শাহ ঃ কায়কাউসের পর তাঁর পুত্র সামস্-উদ্-দীন ফি(জ শাহ ১৩০১ থেকে ১৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লখ্নৌতির বিশাল রাজ্য শাসন করেন। তঁর সময় সাতগাঁ, ময়মনসিংহ, সোনারগাঁ এমন কি সুদূর শ্রীহট্টও গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত(ছিল। ফি(জ শাহ্ শক্তি(শালী এবং সুযোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন, তবে তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশী কিছু জানা যায় না।

গিয়াস্-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্ ঃ সামস্-উদ্-দীনের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র গিয়াস্-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্ সিংহাসনে অধিকার করেন। কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভাই এবং কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি(তাঁর অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দিল্লীর বাদশাহ গিয়াস্-উদ্-দীন তুঘলকের নিকট অভিযোগ করেন। বাদশাহ স্বয়ং পূর্ব ভারতে অভিযান করেন এবং যুদ্ধে গিয়াস্-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ পর্যুদস্ত এবং বন্দী হন। পরে তাঁকে মুক্তি(দেওয়া হয় এবং সোনার গাঁয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত(করা হয়। বাংলা এই সময় উত্তর, পূর্ব ও দ(িণ (লখ্নৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ) এই তিন ভাগে বিভক্ত(ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অধীনস্থ ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। শেষ দিকে গিয়াস্-উদ্-দীন দিল্লীর বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেন কিন্তু তাঁর সহকারী বহরাম খাঁর নিকট পরাজিত ও নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। কারও কারও মতে মুর্শিদাবাদ জেলার গিয়াসাবাদ নগর তাঁর সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়।

MURSHIDABAD 3RD # 91
21-9-2003

এর পর দশ বছর অর্থাৎ ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাদির খাঁ, বহরাম খাঁ এবং ইজ্-উদ্-দীন ইয়াহিয়া খাঁ বাদশাহ্ মহম্মদ তুঘলকের অধীনে লখ্নৌতি, সোনারগাঁ ও সাতগাঁ শাসন করেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ ঃ বহরাম খাঁর মৃতুর পর (১৩৩৮) তাঁর অস্ত্রবাহক ফকির্-উদ্-দীন সোনারগাঁ অধিকার করে ফকির্-উদ্-দীন মুবারক শাহ্ (১৩৩৮-১৩৪৯) নাম গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি সাময়িকভাবে লখ্নৌতিও অধিকার করেন। তাঁর সময় বিখ্যাত পর্যটক ইবন্ বতুতা বাংলায় আসেন।

ফকির্-উদ্-দীনের পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ার্-উদ্-দীন গাজী শাহ্ পূর্ববঙ্গের রাজা হন (১৩৪৯-১৩৫২ খ্রীঃ)। তাঁকে দূরীভূত করে হাজী ইলিয়াস সোনারগাঁ অধিকার করেন (১৩৫২-৫৩)। এই সময় লখ্নৌতিতে রাজত্ব করছিলেন আলা-উদ্-দীন আলি শাহ্ (১৩৪১-৪২)। তিনি লখ্নৌতি থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পাণ্ডুয়া তার পর প্রায় একশ বছর বাংলার রাজধানী ছিল। আলা-উদ-্দীন হাজী ইলিয়াস কর্তৃক নিহত হন এবং ইলিয়াস গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ)।

ইলিয়াস শাহী রাজবংশ ঃ হাজী ইলিয়াস সামস্-উদ্-দীন ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-৫৮) নাম গ্রহণ করেন। সুলতান হয়েই তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। প্রথমেই তিনি সাতগাঁ দখল করেন। তিনি নেপালে অভিযান করেন এবং সে দেশ লুণ্ঠন করেন। উড়িষ্যায় তিনি চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত অভিযান করেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে ফিরে আসেন। চম্পারণ, গোর(পুর এবং বারাণসী ও কামরূপের অংশ বিশেষ তিনি অধিকার করেন। দিল্লীর সুলতান ফি(জ শাহ্ তুঘলক তাঁর বি(দ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ফলে নব অধিকৃত অঞ্চলগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হলেও বাংলা থেকে ইলিয়াসকে উচ্ছেদ করা যায় নি।

সিকন্দার শাহ্ ঃ ইলিয়াস শাহ্ এর পর তাঁর পুত্র সিকন্দার শাহ্ (১৩৫৮-১৩৯০) সুলতান হন। তিনি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তাঁর সময় ফি(জ শাহ্ তুঘলক আবার বাংলা আত্র(মণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় (১৩৫৯)। এর পর প্রায় দুই শতাব্দীকাল বাংলা দিল্লীর দ্বারা আত্র(ান্ত হয়নি। আদিনা মসজিদ নির্মাণ (১৩৬৯) সিকন্দার শাহ্-এর এক মহৎ কীর্তি। বাংলার সর্ব বৃহৎ এই মসজিদের স্থাপত্যও অসাধারণ।

গিয়াস্-উদ্-দীন আজম শাহ্ ঃ সিকন্দর শাহ্-এর পুত্র গিয়াস্-উদ্-দীন আজম শাহ্ সুলতান হন। তিনি অনেক দুর্লভ গুণের অধিকারী ছিলেন। 'রিয়াজ্-উস্-সালাতিন' অনুসারে তিনি একটি গজল রচনা আরম্ভ করে শেষ করতে না পারায় পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দেন। হাফিজ ঐ গজল সম্পূর্ণ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তাঁর আমলে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলায় চীন দেশের দূত প্রেরণ (১৪০৬)। সুলতানও চীনে দূত প্রেরণ করেন। পিতা পিতামহের মত তিনিও ধার্মিকদের (ফকির ও সুফী সন্ত) প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কুড়ি বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

গিয়াস্-উদ্-দীনের পর তাঁর পুত্র সৈফ্-উদ্-দীন হামজা শাহ্ সুলতান হন। তারপর সুলতান হন সিহার্-উদ্-দীন বায়াজীদ্ শাহ্। ইনি ইলিয়াস বংশের সন্তান ছিলেন না। বায়াজীদের পর তাঁর শিশুপুত্র আলা-উদ্-দীন ফি(জ্ শাহ্ এর নাম সুলতান রূপে পাওয়া যায়। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে মসনদ দখল করেন রাজা গণেশ (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

রাজা গণেশ ঃ গিয়াস্-উদ্-দীন আজম শাহ্ এর পর কিছুদিন রাজ্যে প্রচণ্ড রকম বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই সময় ভাতুরিয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ (দনুজমর্দন দেব) অত্যন্ত শক্তি(শালী এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন এবং বাংলার সুলতানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সিংহাসন অধিকার করেন। তবে তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পিতার বিরোধিতা ও তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে জালাল-উদ্-দীন শাহ্ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু গণেশ পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন। মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয় (১৪১৯)। সমগ্র মধ্যযুগের ইতিহাসে গণেশই বাংলার একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাজা রূপে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর পুত্র জালাল-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্ পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সামস্-উদ্-দীন আহম্দ শাহ্ রাজা হন। তিন বৎসর পর তাঁর ত্রীতদাসগণ তাঁকে হত্যা করে।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী অথবা মাহ্মুদ শাহী বংশ ঃ এরপর আবার ইলিয়াস শাহ্-এর পৌত্র নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্ (১৪৩৭ মতান্তরে ১৪৪২-৫৯) গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। নাসির-উদ্--দীনের শাসনকাল মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল। অবশ্য তার সময়ে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেব (১৪৩৫-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাংলা আত্র(মণ করেন। তিনি দ(িণ রাঢ় অধিকার

করলেও মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল গৌড়ের অধিকারেই থেকে যায়। অবশ্য উড়িষ্যার এই জয় বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

(কন-উদ্-দীন বারবক শাহ্ ঃ নাসির্-উদ-দীনের পুত্র (কন্-উদ্-দীন বারবক শাহ্ (১৪৫৯-১৪৭৪) বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। সম্ভবতঃ তিনিই উড়িষ্যার হাত থেকে দ(িণবঙ্গ পুন(দ্ধার করেন এবং বাংলার উত্তর-পশ্চিমে ত্রিহুত অধিকার করেন। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিদ্বান ব্যক্তি(দের তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর সময়েই 'শ্রীকৃষ(বিজয়ের' কবি মালাধর বসু এবং মিথিলার পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্র এবং সম্ভবতঃ রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস আবির্ভূত হন এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। মুসলমান পণ্ডিতদের মধ্যে ইব্রাহিম কোয়ায়ুম খাঁর নাম করা যায়।

সাম্স্-উদ্-দীন ফতে ইউসুফ শাহ্ ঃ বারবক শাহের পুত্র সাম্স্-উদ্-দীন ফতে ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪-৮১) ধার্মিক রাজা ছিলেন এবং তাঁর সময়ে গৌড়ে বিখ্যাত 'লোটন মসজিদ' ও 'চামকাটি' মসজিদ সমেত বহু মসজিদ নির্মিত হয়।

জালাল-উদ্-দীন ফতে শাহ্ ঃ এরপর নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহের কোন এক পুত্র জালাল-উদ্-দীন-ফতে শাহ্ (১৪৮১-৮৭) সুলতান হন। তিনি বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ এবং মহানুভব রাজা ছিলেন। মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর প্রশংসা করেছেন। তাঁর আমলে আবিসীনিয় ত্রীতদাসেরা অত্যন্ত শক্তি(শালী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন শেষ হয়ে যায়।

হাবসী (আবিসীনিয়) শাসন ঃ ফতে শাহ্কে হত্যা করে খোজা শাহজাদা সুলতান দ্বিতীয় বারবক শাহ্ নামে সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র কয়েকমাস রাজত্ব করেন। তাঁর প্রধান উজির মালিক আণ্ডিল তাঁকে হত্যা করে সৈফ্-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্ (১৪৮৭-৯০) নাম নিয়ে সিংহাসনে অধিকার করেন। ফিরোজ শাহ্ মহৎ, দয়াবান এবং অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রজার মঙ্গলের জন্য তিনি নানা রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গৌড়ের বিখ্যাত ফিরোজ মিনার তাঁর সময়েই নির্মিত হয়। তিনিও নিহত হন তাঁরই প্রাসাদর(ী পাইকদের হাতে।

পরবর্তী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ নাসির-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্ (১৪৯০-৯১)। তিনি সৈফ্-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্ মতান্তরে ফতে শাহ্ এর পুত্র। তিনি তাঁর অমাত্য আবিসীনিয় ত্রীতদাস সিদি বদরের ষড়যন্ত্রে তাঁর পাইকদের দ্বারা নিহত হন। সিদি বদর সামস্-উদ্-দীন মজঃফর শাহ্ (১৪৯১-৯৩) নামে সিংহাসনে বসেন। অত্যাচারী মজঃফর শাহ্ও তাঁরই পাইকদের দ্বারা নিহত হন।

পীর মসনদ্ আউলিয়া ও কারবালা মসজিদ ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফকির মসনদ্ আউলিয়া নামক এক সুফী ফকির মুর্শিদাবাদে ধর্মপ্রচার করতে এসে কাশিমবাজারের সমীপবর্তী চুনাখালিতে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চুনাখালিতে তাঁর দরগা অবস্থিত। আউলিয়ার সমাধির উপর নির্মিত গৃহটি খুব বেশী দিনের নয়। সম্ভবতঃ মূল সমাধি গৃহটি ধ্বংস হলে বহুদিন পরে আবার গৃহটি নির্মিত হয়েছে। এই গৃহের পূর্বদিকের বাহিরের দেওয়ালের তুঘরা লিপিতে উৎকীর্ণ একটি প্রস্তর ফলক ও দ(িণের দেওয়ালে আরবী অ(রে উৎকীর্ণ আর একটি শিলালিপি গ্রথিত আছে। প্রথম লিপি অনুসারে গৌড়ের সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ নাসির্-উদ্-দীন মহম্মদ শাহ্-এর রাজত্বকালে ৮৯৬ হিজরির মহরম মাসের দ্বিতীয় দিনে (রবিবার, ১৫ নভেম্বর ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ) একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি নিকটবর্তী কারবালায় (বহরমপুর পঞ্চাননতলার সামান্য উত্তরে) এখনও বর্তমান। অবশ্য উপরের অংশটি ভেঙে পড়লে পুরাতন ভিত্তির উপরেই মসজিদ্টি নতুন করে নির্মিত হয়েছে। দ্বিতীয় লিপিটিতে মহম্মদ-হুদাদ্-উল-মুলতানী নামক জনৈক ব্যক্তি(র নাম উল্লিখিত এবং তারিখ ১১৫৩ হিজরির রবিউল আওয়াল মাস (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। এই মসজিদের কোন অস্তিত্ব এখন নাই। এই দরগার কিছুটা উত্তর-পূর্বে অজ্ঞাত পরিচয় পীর মখ্দুম শাহ্-এর সমাধি।

হুসেন শাহী রাজবংশ/
আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯)

সুদীর্ঘ সুলতানী আমলে যে সকল সুলতান অথবা প্রশাসক বাংলা শাসন করেছেন তাঁদের মধ্যে হুসেন শাহ্ বহুদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। মুর্শিদাবাদ জেলা, বিশেষ করে জঙ্গীপুর মহকুমার সঙ্গে হুসেন শাহ্-এর সম্পর্ক নিবিড়।

হুসেনের প্রথম জীবন ঃ হুসেনের বাল্য ও যৌবনের সঙ্গে জঙ্গীপুরের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী যেমন আছে, তেমনই বেশ কিছু লিখিত বিবরণও আছে। হুসেন বাল্যকালে পিতা সৈয়দ আশরাফের সঙ্গে মধ্যে এশিয়ার তিরমিজ শহর থেকে এদেশে আসেন। সাগরদীঘি থানায় মণিগ্রামের নিকট চাঁদপাড়ায় তাঁর পিতা প্রথম বসবাস করেন। মতান্তরে চাঁদপাড়াতেই তাঁর জন্ম হয়। দরিদ্র হলেও সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ায় তৎকালীন উচ্চ মুসলমান সমাজে তাঁরা যথেষ্ট সম্মানের

পাত্র ছিলেন। দারিদ্রহেতু হুসেনকে চাঁদপাড়ার জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের (নামান্তর চাঁদ রায়) অধীনে সামান্য কাজ করতে হয়। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে চাঁদপাড়ার কাজী সাহেব হুসেনকে উচ্চ বংশীয় সন্তান জানতে পেরে তাঁকে সমাদরে নিজগৃহে রেখে লেখা-পড়া শেখান এবং নিজের কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। পরবর্তীকালে প্রধানত সুবুদ্ধি রায়ের সহায়তায় তিনি গৌড়ের রাজদরবারে উচ্চ পদে আসীন হন। সুবুদ্ধি রায় গৌড়ের 'অধিকারী' অর্থাৎ প্রশাসনের কর্তা ছিলেন। শীঘ্রই হুসেন মজঃফর শাহ্ এর উজীর (প্রধানমন্ত্রী) পদে উন্নীত হন। (নিখিলনাথ রায়)

গৌড়ে তখন প্রচণ্ড অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। এই ভয়ানক অরাজকতার হাত থেকে র(া পাওয়ার জন্য গৌড়ের আমীর-ওমরাহগণ হাবসী সুলতান মজঃফর শাহ্-এর স্থানে হুসেনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত(করেন। মজঃফর শাহ্ এত অত্যাচারী ছিলেন যে সকলেই তাঁর বি(দ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন এবং এই সুযোগে মন্ত্রী হুসেন তাঁকে হত্যা করে সুলতান হন। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকেরা বলেন, হুসেন বি(দ্ধদের সাহায্যে মজঃফর শাহ্-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ছয় মাস-কাল যুদ্ধ এবং রক্ত(পাতের পর মজঃফর পরাজিত ও নিহত হন। মতান্তরে হুসেন পাইক সর্দারদের উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে তাঁদের সহায়তায় সুলতানকে হত্যা করেন। বাবরের আত্মজীবনীতে দ্বিতীয় মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। (আর.সি.মজুমদার, হিস্ট্রি অব্ মেডিয়াভেল বেঙ্গল, পৃঃ ৪৭)। হুসেনের গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হাবসীদের অত্যাচার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

হুসেন শাহ্ সুলতান হওয়ার পর সুবুদ্ধি রায়ের পদগৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হুসেন শাহ্ সুবুদ্ধি রায়কে চাঁদপাড়া গ্রামখানি মাত্র এক আনা খাজনায় অর্পণ করেন।

কৃষ(দাস কবিরাজ কৃত 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলায় (২৫ পরিচ্ছেদ) উল্লিখিত হুসেন কর্তৃক সুবুদ্ধি রায়ের জাতিচ্যুতি এবং চৈতন্যদেবের উপদেশে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গমন ও সেখানে ভি(াবৃত্তির দ্বারা জীবনধারণের ঘটনা অনেকেই সত্য বলে স্বীকার না করলেও রমেশচন্দ্র মজুমদার এর ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করেন নি (ঐ পৃঃ ৪৮-৪৯)।

হুসেন শাহ্-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ একমাত্র আসাম ছাড়া হুসেন শাহ্-এর বিজয় অভিযান সর্বত্রই সাফল্য লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে (১৫১৯) সমগ্র বাংলা ছাড়াও কামরূপ, বিহারের শরণ জেলা পর্যন্ত ভূভাগ এবং ত্রিপুরার অংশ বিশেষও তিনি তাঁর রাজ্যভুক্ত(করেছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ(দ্রদেবের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ হয় এবং এক সময় তাঁর বাহিনী পুরী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তবে উড়িষ্যা তিনি স্থায়ীভাবে অধিকার করতে পারেন নি।

শাসক রূপে হুসেন শাহ্র কৃতিত্ব সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। তাঁর রাজত্বকালে দেশের কোথাও বিদ্রোহ এবং অশান্তি হয়নি, যা তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের শাসনকালে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। তিনি দেশে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন এবং সুশাসন প্রবর্তন করেন তার ফলে বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রে এক যুগান্তর সূচিত হয়। স্বয়ং সুশি(িত সুলতান বিদ্বান এবং ধার্মিকদের যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কেবল গৌড়েই নয়, দেশের অন্যত্রও অনেক শি(ায়তন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজ তিনি শাসনকার্যে এবং অন্যান্য (ে ত্রে উচ্চপদে বহু হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন এবং তাঁদের উপর গু(ত্বপূর্ণ কার্যভার অর্পণ করেন। তিনি যেমন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তেমনই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং কার্যের জন্য হিন্দুরা তাঁকে কৃষে(র অবতার বলেও মনে করেছেন। এই সব কারণে বাংলার সুলতানদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। তাঁর ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নম্রতা এবং উদারতা জনগণের হৃদয় জয় করেছিল। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সমসাময়িক সাহিত্যে তাঁকে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎভূষণ' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সর্বব্যাপী অত্যাচার, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মীয় বিভেদ প্রভৃতিতে যে দেশ জর্জরিত, সে দেশে তিনি শান্তি, সুবিচার এবং রাজনৈতিক গৌরব নিয়ে আসেন। মানুষকে কেবল বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রদানই নয়, হৃদয়ের উদারতা ও ধর্মীয় সার্বজনীনতা প্রভৃতি গুণের জন্য মহামতি আকবরের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে তাঁর কোন তুলনা হয় না (আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার, হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, খন্ড-২, ঢাকা বি(বিদ্যালয়- পৃঃ ১৫০-৫২) অবশ্য তাঁর ধর্মীয় উদারতার বিষয়ে কেউ কেউ প্র(ও তুলেছেন। কারণ তিনি উড়িষ্যায় পুরীর মন্দির ও দেব- বিগ্রহের (তিসাধন ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি দেখিয়েছিলেন (আর.সি. মজুমদার, হিস্ট্রি অব্ মেডিয়াভেল বেঙ্গল, খন্ড-২, ঢাকা বি(বিদ্যালয়- পৃঃ ৫৫-৫৭)

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঃ হুসেন শাহ্-এর রাজত্বকালের এক অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) আর্বিভাব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিদ্বেষে জরাজীর্ণ বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রীচৈতন্য যে প্রেমের বাণী এবং সার্বজনীন মানবধর্মের

প্রচার করেন তার ফলে বাংলায় এক নবযুগের সূচনা হয় এবং তার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। চৈতন্যের প্রভাব আজও বাংলার সমাজ ও জনজীবনে অব্যাহত। চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ(ব ধর্ম বাংলার জনজীবনকে ভক্তি(র বন্যায় প-াবিত করে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও এর ব্যতিত্র(ম হয়নি, যদিও চৈতন্যের জীবদ্দশায় পার্শ্ববর্তী নদীয়া, বর্ধমান, হুগলি, চব্বিশ-পরগণা প্রভৃতি জেলার তুলনায় মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ধর্মের প্রসার কিছুটা কম ছিল। চৈতন্যদেব এই জেলার রাঢ় অঞ্চল পরিত্র(মা করেছিলেন এবং এই জেলার ভূখণ্ড অতিত্র(ম করেই গৌড়ে (রামকেলী) উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর আবাল্য সঙ্গী ও সহচর গদাধর গোস্বামী ভরতপুরে শ্রীপাট স্থাপন করেন। নিকটবর্তী কাঞ্চনগড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসের শ্রীপাটও এই সময়েরই। খড়গ্রাম থানায় মাড়গ্রামের বৈষ(ব কেন্দ্রে নিত্যানন্দ পদার্পণ করেছিলেন। তবে মুর্শিদাবাদ জেলায় গৌড়ীয় বৈষ(বধর্মের বিপুল প্রসার ঘটে চৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তীকালে, প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাসের (দত্ত) দ্বারা।

হুসেন শাহের আমলে নিমতিতার নিকটবর্তী জীয়ৎকুড়িতে (সামশেরগঞ্জ থানা) এক তিওর রাজার কথা নিখিলনাথ উল্লেখ করেছেন। নিম্নবর্গীয় এই রাজা নাকি হুসেন শাহ্-এর বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। নিকটবর্তী মহেশাইল গ্রামে (সুতি থানা) মঙ্গলসেন নামক এক রাজা বা জমিদারের কথাও তিনি বলেছেন। তিনি হুসেন শাহ্-এর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পৃঃ ১৮০-৮৫)। মঙ্গলসেনের প্রতিষ্ঠিত এক বিশাল দীঘি এবং তীরবর্তী বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান।

মুর্শিদাবাদ জেলায় হুসেন শাহ্-এর আমলের কীর্তি ঃ হুসেন শাহ্-এর সঙ্গে এই জেলার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। চাঁদপাড়ায় তাঁর প্রাসাদ এবং তাঁর নির্মিত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। তাঁর তত্ত্বাবধানে খনিত বলে কথিত 'চাঁদদীঘি'ও ঐ গ্রামে বর্তমান, তবে দীঘির পাড়ে সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদের যে উল্লেখ নিখিলনাথ রায় করেছেন তার কোন চিহ্(এখন দেখা যায় না। হুসেন শাহের খনিত 'সেখদীঘি' (থানা সাগরদীঘি) তাঁর আর একটি মহৎ কীর্তি। হুসেন শাহ্-এর অবিন(রে কীর্তি গৌড় থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত 'বাদশাহী সড়ক' নামক এক প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ, যা সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলাকে অতিত্র(ম করে প্রসারিত হয়েছে। এই পথের দু'পাশে তিনি বহুসংখ্যক দীঘি, পুষ্করিণী, মসজিদ, সরাইখানা প্রভৃতিও নির্মাণ করে দেন। এই সব দীঘির মধ্যে সেখদীঘিই সব চেয়ে বড়। তিরমিজ শহর থেকে আগত বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ফকির আবু সৈয়দ তিরমিজের নামে দীঘিটি তিনি উৎসর্গ করেন। দীঘির পশ্চিম পাড়ে এই ফকিরের সমাধিও আছে। এই রাজপথেই তাঁরই সময়ে দ্বারকা নদীর ওপরে উপর নির্মিত সেতুটি (সাঁকোর ঘাট, খড়গ্রাম থানা) -র ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। খে(র গ্রামে (থানা সাগরদীঘি) বিখ্যাত মসজিদটি হুসেন শাহ্-এর সময় তাঁর এক সেনাপতি খাঁ মহম্মদ রিফাৎ খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয় (১৪৯৫) । সাগরদীঘির নিকটে ব্রাহ্মণী গ্রামের পুরাতন মসজিদ (মসজিদটি সম্প্রতি পুনর্নির্মিত হয়েছে), আতাই-এর (খড়গ্রাম থানা) একটি মসজিদ এবং বাহাদুরপুরের (বড়এ(া) মসজিদটিও সম্ভবতঃ তার সময়েই নির্মিত হয়।

নাসির্-উদ্-দীন-নসরত শাহ্ (১৫১৯-৩২) ঃ হুসেন শাহ্-এর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র নসরৎ শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়ে তিনি এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি হন। প্রায় সমগ্র বাংলা ছাড়াও ত্রিহুত, বিহারের অধিকাংশ এবং যুক্ত(প্রদেশের একটি অংশও তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি গৌড়ের বিখ্যাত বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তিনি সম্ভবতঃ ঘাতকের হাতে নিহত হন।

নসরৎ শাহ্-এর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় আলা-উদ্-দীন ফিরোজ শাহ্ সিংহাসনে বসেন কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই খুল্লতাত গিয়াস-উদ্-দীন মাহমুদ শাহ্-এর দ্বারা নিহত হন (১৫৩৩)।

শের শাহ্ ঃ গিয়াস্-উদ্-দীন মাহমুদ্ শাহ্ (১৫৩৩-৩৮) হুসেন শাহ্-এর এক পুত্র এবং এই বংশের শেষ সুলতান। তাঁর সময় আফগান সর্দার শের খাঁ (পরবর্তী কালের শের শাহ্) বিহার থেকে বাংলায় এসে গৌড় আত্র(মণ ও লুণ্ঠন করেন। দূর্ভেদ্য গিরিবর্ত্ম সকরিগলি ও তেলিয়াগরির (রাজমহলের নিকট গৌড়ের প্রধান প্রতির(া কেন্দ্র) পথে না এসে কতকটা বখ্ত-ইয়ারের পথ ধরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর দিয়ে তিনি বাংলায় প্রবেশ করেন। প্রথমে গৌড় লুণ্ঠন করে তিনি বিহার ফিরে যান। ফেরার পথে খড়গ্রাম থানার শেরপুরে তিনি পুত্র জালাল খাঁর সঙ্গে মিলিত হন (১৫৩৮)। তাঁরই নাম অনুসারে ঐ স্থানের নাম শেরপুর। মাহমুদ শাহ্ দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনের শরণাপন্ন হন। হুমায়ুন স্বয়ং গৌড় অভিযান করেন এবং নানা স্থানে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের পর শের খাঁ শেষ পর্যন্ত বাংলা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তবে তিনি গৌড় লুণ্ঠন করেঅপরিমিত অর্থ সঙ্গে নিয়ে যান। কিছুদিন পর তিনি পুনরায় গৌড় আত্র(মণ করেন। মাহমুদ

MURSHIDABAD 3RD # 95
21-9-2003

পরাজিত এবং নিহত হন এবং শের খাঁ (শের শাহ্) বাংলার অধিপতি হন। হুমায়ুন পুনরায় বাংলায় অভিযান করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত (১৫৪০) সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন। শের শাহ্ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। দুশ বছর পর বাংলা স্বাধীনতা হারিয়ে দিল্লীর শাসনাধীনে আসে। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্-এর মৃত্যু হয়। শের শাহ্ তাঁর অল্পকালের রাজত্বে সংস্কারের দ্বারা বাংলার শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার অনেক উন্নতি ঘটান। সেই জন্য তাঁর শাসনকাল স্বল্পস্থায়ী হলেও বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

শের শাহ্-এর পর তাঁর পুত্র জালাল খাঁ আট বৎসর (১৫৪৫-৫৩) রাজত্ব করেন। তারপর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফি(জ শাহ্ এবং ফি(জ শাহের পর শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ আদিল শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই সময় থেকেই দিল্লী এবং বাংলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক (ে ত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বাংলার আফগান শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তিনি পরাজিত হলে শাহবাজ খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা রূপে পাঠান হয়। শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করে গিয়াস্-উদ্-দীন বাহাদুর শাহ্ বাংলার শাসনকর্তার পদ অধিকার করেন (১৫৫৬)। ইতিমধ্যে হুমায়ুন সিকন্দার শূরকে পরাজিত করে দিল্লী ও পাঞ্জাব পুন(দ্ধার করেন। গিয়াস্ উদ্-দীনের পর তাঁর ভাই জালাল-উদ্-দীন দ্বিতীয় গিয়াস্ উদ্-দীন নাম গ্রহণ করে সুলতান হন (১৫৬০-৬৩)। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র সুলতান হলেও কয়েক মাস পর তাঁকে হত্যা করে সুলতান হন তৃতীয় গিয়াস্ উদ্-দীন। এক বৎসর তিনি নিজেও কাররাণী বংশের তাজ খাঁর দ্বারা নিহত হন এবং তাজ খাঁ বাংলার সুলতান হন (১৫৬৪)।

কাররাণী বংশ ঃ তাজখাঁর পর তাঁর ভাই সুলেইমান কাররাণী (১৫৬৫-৭২) সিংহাসনে বসেন। তিনি অত্যন্ত দ(এবং শক্তি(শালী শাসক ছিলেন। মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে তিনি সখ্য বজায় রাখেন এবং উড়িষ্যার পুরী, পশ্চিমে শোণ নদ এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ভূভাগ তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। গৌড় ত্র(মশঃ অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠায় তিনি তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁর সুশাসনে বাংলার শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ কাররাণী রাজা হন। কিন্তু তাঁর ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি অমাত্যদের দ্বারা নিহত হন। বায়জিদ মোগল সম্রাট আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর পুত্র দায়ুদ কাররাণী অমাত্যদের দ্বারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও পিতার মতই আকবরের আনুগত্য অস্বীকার করেন। আকবর তাঁর বি(দ্ধে সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠান। বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার নানা স্থানে দীর্ঘকাল ধরে আফগানদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ চলে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুনিম খাঁর মৃত্যু হলে আকবর হাসান কুলী বেগ (খান্-ই-জাহান) কে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত(করেন। শেষ পর্যন্ত ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলের নিকট যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ পরাজিত হন এবং তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। দায়ুদের মা নওলাখা বেগম এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তি(গণ মুর্শিদাবাদ জেলার গোয়াসে খান্-ই-জাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এইভাবে বাংলার আফগান শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য কিছু কিছু আফগান সর্দার বাংলার নানা স্থানে আরও অনেক দিন স্বাধীনতা বজায় রেখেছিলেন।

মোগল আমল ঃ প্রথম পর্ব (১৫৭৬-১৭০৪)

দায়ুদ খাঁর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মোগল অধিকারের সূত্রপাত হলেও প্রকৃতপ(ে সতের শতকের আগে মোগল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলা ত্যাগ করে আফগানেরা উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ ও সেখানে আধিপত্য বিস্তার করে সেখান থেকে বাংলায় বার বার অশান্তির সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে কিছু হিন্দু-মুসলমান জমিদার (বারভুঁইয়া) মোগলদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আকবর শেষ পর্যন্ত মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান (১৫৯৪)। প্রধানতঃ তাঁর সময়েই এই অঞ্চলের বিরোধী শক্তি(র উচ্ছেদ হয়, যদিও তা একেবারে তা শেষ হয়ে যায় নি। মানসিংহ গৌড়ের নিকট তাণ্ডা থেকে রাজধানী রাজমহলে নিয়ে আসেন। ১৬০০ মতান্তরে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে খড়গ্রাম থানার আতাই-এর যুদ্ধে (যুদ্ধ হয় নগর ও আতাই-এর মধ্যবর্তী মুর্চা গ্রামে) পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ ও অন্যান্য পাঠান সর্দারদের পরাজিত করে তিনি এ অঞ্চলে মোগল শাসন দৃঢ়বদ্ধ করেন। প্রকৃতপ(ে অবশ্য জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই বাংলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ নগরের পত্তন ঃ মানসিংহের ঠিক আগে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন সৈয়দ খাঁ (১৫৮৭-১৫৯৪)। কিন্তু তিনি পাঠান ও অন্যান্যদের বিদ্রোহ দমন করতে না পারলেও বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশেষ করে ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনে হয়। তাঁর সময়েই মুর্শিদাবাদ নগরীর (প্রথমে মক্সুদাবাদ বা মখ্সুসাবাদ) পত্তন

হয় বলে মনে করা হয়। (ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, ১৭৭৯) মুর্শিদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্বনাম সম্বন্ধে অবশ্য 'নানা মুনির নানা মত'। একটি মত অনুসারে হুসেন শাহ্-এর আমলে মুকসূদন দাস নামক জনৈক নানকপন্থী সন্ন্যাসী এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নাম অনুসারে এই নগরের নাম মুকসুদাবাদ। টিফেন থেলারের মতে, এই নগর আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রথমে নগরের নাম ছিল আকবরপুর (মুর্শিদাবাদ শহরে আকবরপুর নামে একটি মৌজা এখনও বর্তমান)। 'আকবরনামা' অনুসারে সুবাদার সৈয়দ খাঁর ভাই মকসুস খাঁ এখানে একটি সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং সেটিকে কেন্দ্র করেই এই শহরের পত্তন এবং নাম হয় মকসুসাবাদ। 'ভবিষ্যপুরাণে'র ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে (ভবিষ্যপুরাণের রচনা কাল আনুমানিক ১৫-১৬ শতক) উল্লিখিত আছে এই শহর কোনও এক যবনের প্রতিষ্ঠিত এবং নাম 'মোরাসুদাবাদ'। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, এই শহরের পূর্ব নাম 'মাসুমাবাজার'(কে. এন. কলেজ সেন্টেনারী কমেমোরেশন ভলিউম) ট্যাভারনিয়ার লিখেছেন (১৬৬৬) 'মাদেসুবাজারকী'। সমসাময়িক ইংরেজদের লেখায় এর নাম মুকসুদাবাদ (Muxudabad) । যাই হোক মুর্শিদাবাদ নামকরণের আগে যে দুটি নাম বহুল প্রচলিত ছিল তা হল মকসুদাবাদ এবং মখসুসাবাদ। তবে এই নগর যে আগে থেকেই বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ ছিল তাতে সন্দেহ নাই। এখানে ফৌজদারী ও রাজস্বসংগ্রহ কার্যালয় অবস্থিত ছিল এবং এটি একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বহরমপুর শহরের অন্তর্গত সৈয়দাবাদের নামকরণও সম্ভবতঃ সৈয়দ খাঁ নাম অনুসারে হয়েছে। তবে দীর্ঘকাল ধরেই যে মুকসুদাবাদ এবং সৈদাবাদের (সৈয়দাবাদ) রেশম শিল্প অত্যন্ত উন্নত ও প্রসিদ্ধ ছিল তা ইউরোপীয়দের লেখা থেকেই জানা যায়।

টোডরমল ঃ আকবরের নির্দেশে তাঁর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর যে বিখ্যাত রাজস্ব বিভাগের তালিকা (রেন্ট রোল) প্রস্তুত করেন তাতে সুবা বাংলাকে ১৯টি সরকার এবং তদন্তর্গত ৬৮২টি মহলে ভাগ করা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলটি যে সব সরকারের অধীনে ছিল সেগুলি হল (১) সরকার উদুম্বর (ঔদুম্বর) বা তাণ্ডা, রাঢ় বাগড়ীর অধিকাংশ নিয়ে জেলার উত্তর অঞ্চল, (৩) সরকার মাহমুদাবাদ, জেলার পূর্ব অঞ্চল অর্থাৎ বাগড়ীর কিছুটা অংশ, (৩) সরকার শরিফাবাদ, ফতেসিংহ (কান্দী অঞ্চল), মহলন্দী, নবগ্রাম, খড়গ্রাম প্রভৃতি অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের একটি বিরাট অংশ, (৪) বরবাকাবাদ, বেলডাঙ্গা, নওদা, হরিহরপাড়া, ডোমকল, রাণীনগর প্রভৃতির বাগড়ীর পূর্ব ও দ(িণ অঞ্চল, (৫) সরকার সাতগাঁ কান্দী মহকুমার দ(িণ দিকের কিছুটা অংশ (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড) অর্থাৎ মোগল আমলেও জেলার সমগ্র অংশটি একটি মাত্র শাসন কেন্দ্রের অধীন ছিল না।

সবিতা রায় ঃ মানসিংহের সঙ্গে বুন্দেলখণ্ড থেকে এদেশে এসে ছিলেন সবিতা রায় (সবিতা চাঁদ দী(িত)। তিনি এই সময়েই জেমো-কান্দীতে বসবাস শু(করেন এবং জেমো রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সবিতা রায়কে ছোটখাটো পাঠান সর্দার, শক্তি(শালী কায়স্থ ভূস্বামীগণ এবং 'হাড়িরাজাকে' (ফতে সিংহ) পরাজিত করে তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয় (পুণ্ডরীককুল কীর্ত্তি পঞ্জিকা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। কান্দী শহর এবং কান্দীর (কায়স্থ) রাজবংশ আরও প্রাচীন (বল্লাল সেনের সময়) বলে দাবী করা হয়।

ইসলাম খাঁ ঃ জাহাঙ্গীরের আমলে মানসিংহের কিছুদিন পর বাংলার সুবাদার হন ইসলাম খাঁ (১৬০৮-১৩)। তিনিই প্রকৃতপ(ে বাংলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় কোন রকম বিদ্রোহ বা বিশৃঙ্খলা না থাকলেও বাংলার অন্যত্র তখনও আঞ্চলিক রাজা-জমিদারগণ এবং পাঠান সর্দারেরা মোগল শক্তি(কে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল। ইসলাম খাঁর আমলেই যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বি(দ্ধে বাগড়ী অঞ্চল দিয়ে জল ও স্থল পথে এক মহা সমরাভিযান প্রেরিত হয়। ইসলাম খাঁ ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাগড়ী অঞ্চলের গোয়াসে পৌঁছান। ভগবানগোলা সংলগ্ন আলাইপুরে পদ্মা পার হয়ে স্থলবাহিনী ভৈরব ও জলঙ্গীর তীর বরাবর গিয়াস্ খাঁর নেতৃত্বে অগ্রসর হয়। তেমনই মীর্জানাথনের নেতৃত্বে নৌবাহিনী গঙ্গা (পদ্মা) ভৈরব ও জলঙ্গীর স্রোত বেয়ে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের (যশোহর জেলা বাংলাদেশ) দিকে অগ্রসর হয়। এই ইসলাম খাঁর নাম অনুসারেই সম্ভবতঃ ইসলামপুরের নাম। ইসলামপুর গোয়াসের নিকট এবং ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত।

তিন বৎসরের মধ্যেই ইসলাম খাঁ সমগ্র বাংলায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগর) স্থানান্তরিত করেন। সুলতানী আমলে শেষ দিকে রাজ্যময় যে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা চলে তা প্রায় হাজার বছর আগেকার 'মাৎস্যন্যায়েরই সমতুল্য। মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে বাংলার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও শান্তি এবং সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়।

বাংলায় মোগল শাসনের প্রভাব ঃ মোগল শাসনকালে বাংলায় এক নতুন শক্তি(র আর্বিভাব হয়। ফলে বাঙালীর জীবন

ও চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, যার প্রভাব বাঙালীর জীবনে এখনও অল্প বিস্তর দেখা যায়। বাংলার সঙ্গে বর্হিজগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর তার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রবর্তনের ল(ণ দেখা যায় বলে আচার্য যদুনাথ মনে করেন। এর কারণ প্রধানতঃ দুটি (১) সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার এবং (২) বাংলার বৈষ(বদের বিশাল সংগঠন (হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ভলিউম-২, পৃঃ ২১৬)। অর্থাৎ মোগল শাসন বাংলায় এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ইসলাম খাঁর পর সুবাদার হন কাশিম খাঁ (১৬১৪-১৮)। সুবাদার হিসাবে তিনি আদৌ যোগ্য ছিলেন না। ফলে তাঁর আমলে মোগল শাসন আবার দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্ভবত তাঁর নামেই কাশিমবাজারের নামকরণ হয়।

কাশিম খাঁর পর সুবাদার হন ইব্রাহিম খাঁ। তাঁর দ(শাসনে বাংলায় শান্তি ফিরে আসে। তাঁর সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান পিতার বি(দ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলায় আসেন এবং এখানে স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। সম্রাটের পুত্র বলে প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও শাহজাহান যখন রাজমহল অধিকার করেন তখন ইব্রাহিম খাঁ শাহজাহানকে বাধা দেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। শাহজাহান জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) অধিকার ক'রে (১৬২৪) সুবা বাংলা স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। উড়িষ্যা তিনি আগেই অধিকার করেন এবং এখন বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশও অধিকার করেন। কিন্তু তিনি দিল্লী থেকে প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে বাংলা ছাড়তে বাধ্য হন। চার বৎসর পর জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

পর্তুগীজ দমন ঃ শাহজাহানের সময় বাংলায় পর্তুগীজদের সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করা হয়। পর্তুগীজেরা বহু পূর্বে ষোড়শ শতকের প্রথমেই চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে কুঠি স্থাপন করার অনুমতি লাভ করেন (১৫১৭)। আকবর তাঁদের হুগলীতেও কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন (১৫৭৯-৮০)। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য নয়, পর্তুগীজদের প্রধান কাজই ছিল দস্যুতা ও লুণ্ঠন। তাছাড়া মোগলদের বি(দ্ধে তাঁরা প্রত্য(ভাবে বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। আবার শাহজাহান যখন বিদ্রোহ করেন তখন তারা তাঁকে সাহায্য করলেও পরে তারা তাঁর সঙ্গে বি(াসঘাতকতা করেন। পর্তুগীজদের অত্যাচারে বাংলার জনগণ প্রচণ্ডভাবে উৎপীড়িত হয়। এই অত্যাচার নিবারণের জন্য শাহজাহান অসাধারণ দ(এবং অভিজ্ঞ কাশিম খাঁকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান এবং পর্তুগীজদের বি(দ্ধে উপযুক্ত(ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। বিভিন্ন দিক থেকে পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্র হুগলীতেও সৈন্য দল পাঠানো হয়। কাশিম খাঁ তাঁর প্রধান সহকারী বাহাদুর বম্বুকে মকসুদাবাদে পাঠান বাহ্যত সেখানকার উচ্চভূমি দখল করে অবস্থান করতে, কিন্তু গোপনে নির্দেশ থাকে অন্য মোগল বাহিনীর আসার অপে(া করতে। পরে মিলিত বাহিনীর দ্বারা হুগলী সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হয় এবং পর্তুগীজদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা হয় (১৬৩২)।

শাহজাহানের রাজ্যারম্ভ (১৬২৮) থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত (১৭০৭) বাংলায় শান্তি বজায় ছিল এবং সেই সময় এই দেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপ(এই সময়ে বাংলা ছিল সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ সুবা।

শাহজাহান মধ্যম পুত্র সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজার পর আসেন শায়েস্তা খাঁ এবং সব শেষে আজিম-উস্-সান। এঁদের সময় বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

শাহ্ সুজা ঃ সুজার দীর্ঘ শাসনকালে (১৬৩৯-১৬৫৯) বাংলার শান্তি বিরাজিত ছিল। প্রকৃত প(সুজার সময়েই বাংলার নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মোগল শাসনের প্রথম দিকে রাজমহল এবং পরে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় দুরত্ব হেতু মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলটির গু(ত্ব স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা হ্রাস পায়। তবে বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অব্যবহিত পূর্বে (১৬৫৭) রাঢ় অঞ্চলের উত্তর অংশ বিশেষতঃ বর্তমান জঙ্গীপুর মহকুমা অঞ্চলটি গু(ত্ব লাভ করে।

শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে যখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিবাদ ও সংঘর্ষ আরম্ভ হল তখন সুজার সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের তুমুল সংঘর্ষ শু(হয়। ঔরঙ্গজেব সুজাকে দমন করার জন্য সেনাপতি মীরজুমলাকে পাঠালেন। সুজা জাহাঙ্গীরনগর থেকে রাজমহলে পিছিয়ে এলেন এবং রাজমহল এবং মুঙ্গেরে সৈন্যসমাবেশ করে পাটনায় অবস্থানরত মীরজুমলাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করলেন (২২ ফেব্রুয়ারী ১৬৫৯)। কিন্তু মীরজুমলা সোজা পথে অগ্রসর না হয়ে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের অরণ্য অঞ্চল ও বীরভূমের পথে সিউড়ি অতিত্র(ম করে (২৬ মার্চ) ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে ভাগীরথী তীরে বেলঘাটায় (বালিঘাটা, জঙ্গীপুর) শিবির সন্নিবেশ করেন। অগত্যা সুজা রাজমহল ত্যাগ করে গৌড়ের চার মাইল

পশ্চিমে তাণ্ডায় তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এলেন (৪ এপ্রিল)। রাজমহল থেকে হুগলী পর্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম দিকের সমগ্র অঞ্চল ঔরঙ্গজেবের দখলে এল (হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ভলিউম-২, পৃঃ ৩৩৯)।

এরপর মীরজুমলা রাজমহল থেকে দোগাছিতে (সামশেরগঞ্জ থানা) এসে সেখান থেকে কয়েকটি নৌকা সংগ্রহ করে গঙ্গা নদীর মধ্যস্থ একটি উঁচু চরভূমি অধিকার করে সেখানে ঘাঁটি গাড়লেন। নদীর ঠিক অপর তীরেই তাণ্ডায় ছিল সুজার শিবির। মীরজুমলা রাজমহল থেকে সুতি পর্যন্ত নদীতীরে সর্বত্র সৈন্য সমাবেশ করলেন এবং ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মহম্মদকে দোগাছিতে রেখে স্বয়ং সুতিতে অবস্থান করলেন। সুজাকে নতুন করে আত্র(মণের পূর্বে মীরজুমলাকে হুগলী, মকসুদাবাদ ও বর্ধমান থেকে নৌকা ও রসদ সংগ্রহ করতে হল। এদিকে শাহ্জাদা মহম্মদ দোগাছি ত্যাগ করে জুন মাসের এক রাত্রে সুজার শিবিরে চলে আসেন। সুতিতে সৈন্যদলকে শান্ত করে মীরজুমলা দোগাছি গেলেন সেখানকার সৈন্যদের সম্ভাব্য বিদ্রোহের আশঙ্কা করে। সেখানে শাহজাদার শিবিরে সৈন্যরা কিন্তু স্বেচ্ছায় মীরজুমলার আনুগত্য স্বীকার করে। এদিকে বর্ষা এসে পড়ায় মীরজুমলা দোগাছি, দুনপুর (দুর্গাপুর?) এবং সুতি থেকে শিবির সরিয়ে নিয়ে কেবল মাসুমাবাজার (মুর্শিদাবাদ) এবং রাজমহল, এই দুটি স্থানেই সমস্ত শক্তি(কেন্দ্রীভূত করলেন। জুলফিকার খাঁকে রাজমহলের দায়িত্বে রেখে তিনি স্বয়ং মকসুদাবাদে অবস্থান করলেন। প্রবল বর্ষায় সুজাও রাজমহল অবরোধ করে রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদ এবং মুর্শিদাবাদ থেকে হুগলী পর্যন্ত সমস্ত পথে মীরজুমলার রসদ সরবরাহ রোধ করার পরিকল্পনা করলেন। বর্ষার পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনী বেলঘাটা এবং গিরিয়ায় (জঙ্গীপুরের নিকটবর্তী, ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে অবস্থিত) পরস্পরের সম্মুখীন হল। কিন্তু সৈন্য ও সম্পদ (য় না করে মীরজুমলা মুর্শিদাবাদে ফিরে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন বিহারের সুবাদার দায়ুদ খাঁ সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে মিলিত হবেন। মীরজুমলার মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তন ব্যর্থ করতে সুজা ভাগীরথী পার হয়ে নসীপুরের (থানা লালগোলা) অপরদিকে ফেরীঘাটে উপস্থিত হলেন কিন্তু দায়ুদ খাঁর মালদহের অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে সুজা সুতিতে পিছিয়ে এলেন। মীরজুমলা দ্রুত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকবার সংঘর্ষের পর অবশেষে সুজা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি গঙ্গার অপর পাড়ে চলে যান। এরপর সুজাকে বাংলা ত্যাগ করে আরাকানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় এবং সেখানে তিনি নিহত হন।

সুজার পর মীরজুমলাকে বাংলার সুবাদার করা হয় (জুন ১৬৬০)। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরজুমলার মৃত্যু হয়।

ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঃ সতেরো শতকের প্রথম থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলা রেশম উৎপাদন এবং রেশমবস্ত্র বয়নশিল্পে প্রভূত খ্যাতি লাভ করে। ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগণ এই অঞ্চলে রেশমের ব্যবসা শু(করে এই জেলায় কুঠী (Factory) ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। সর্বপ্রথম পর্তুগীজরা এই ব্যবসা শু(করলেও তাঁরা এই জেলায় সম্ভবতঃ কোন স্থায়ী শিল্পকেন্দ্র বা ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন নি। ওলন্দাজরা (Dutch) কাশিমবাজারের সংলগ্ন কালিকাপুর বা কালকাপুরে তাঁদের কুঠী ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন (১৬৫৩)। ইংরেজরা ঐ শতকের প্রথম দিকেই রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করলেও তাঁরা কাশিমবাজারে কুঠী স্থাপন করেন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় কুঠীর অধ্য(ছিলেন জন কেন্ (John Ken)। তিনি বেতন পেতেন বাৎসরিক চল্লিশ পাউণ্ড এবং কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক (Job Charnak) ছিলেন বাৎসরিক কুড়ি পাউণ্ড বেতনের চতুর্থ কর্মচারী। ১৭ শতক শেষ হওয়ার আগেই কাশিমবাজার বাংলায় ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে। সমগ্র বাংলার মোট লগ্নী ২৩০,০০০ পাউণ্ডের মধ্যে কেবল কাশিমবাজারেই লগ্নি ছিল ১৪০,০০০ পাউণ্ড। ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে যখন চার্ণক কুঠীর অধ্য(ছিলেন তখন সুবাদার শায়েস্তা খাঁর আদেশে বাংলার অন্যান্য কুঠীর সঙ্গে সঙ্গে কাশিমবাজার কুঠীও বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে বাদশাহের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চুক্তি(র ফলে ইব্রাহিম খাঁর সময় তাঁদের আবার কাজকর্ম চালাবার অনুমতি দেওয়া হয় (১৬৯০)। ইংরেজদের পর আসেন আর্মেনীয়গণ। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট অনুমতি (ফরমান) লাভ করে তাঁরা ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দাবাদে (সৈদাবাদ) তাঁদের কুঠী স্থাপন করেন। সব শেষে আসেন ফরাসীরা। সৈদাবাদের অন্তর্গত ফরাসডাঙ্গায় তাঁরা কুঠী স্থাপন করেন ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

ইউরোপীয় রপ্তানীকারকগণ বাংলার শিল্প সামগ্রী উৎপাদনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদান করেন। এদেশের সোরা, সুতী ও রেশমবস্ত্র এবং নীলের বিশাল বাজার ছিল এখানে। এদেশে চাষী ও কা(শিল্পীদের দ্বারা উৎপন্ন যে কোন পরিমাণের সামগ্রী কেনার জন্য অপরিমিত অর্থ নিয়ে তাঁরা ছিলেন সদাপ্রস্তুত। আমাদের দেশের উৎপন্ন সামগ্রীর গুণমান-উন্নয়নের ব্যবস্থাও এই বিদেশী বণিকেরা করেছিলেন, যাতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং গুণগত

দিক দিয়েও উপযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়। এ ছাড়া কর্মীদের দাদন দিয়ে নিজস্ব কারখানায় দক্ষ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করে দিয়ে পণ্য উৎপাদনেও যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। এ ছাড়াও ইংল্যাণ্ড থেকে রঙ এবং অন্যান্য বিষয়ের দক্ষ কারিগর নিয়ে এসে এদেশের কারিগরদের উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনেও তাঁরা সাহায্য করেন। এর ফলে বাংলার শিল্পসামগ্রীর যেমন উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় তেমনই উৎপাদনও বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। বাংলার অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ঘুচে গিয়ে বাংলার শিল্প আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে (হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ভলিউম-২, পৃঃ ২১৭)।

শায়েস্তা খাঁ ঃ মীরজুমলার পর সামান্য কিছুদিন দায়ুদ খাঁ ও তারপর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন(১৬৬৪-৮৯)। নানাদিক দিয়ে তাঁর দীর্ঘ শাসনকাল বাংলায় বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি অভূতপূর্ব বিলাসিতা ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর আমলে ব্যবহার্য জিনিষপত্র বিশেষ করে কৃষিজাত দ্রব্যাদি অত্যন্ত সুলভ ছিল। তিনি নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্যে ব্যাপৃত না হলেও উপযুক্ত কর্মচারীদ্বারা দৃঢ়ভাবে দেশ শাসন করেছেন। বাংলার ইউরোপীয় বণিকদের অপরিমিত মুনাফা সত্ত্বেও দেশের রাজস্বে উপযুক্ত শুল্ক না দেওয়া ও সরকারী আদেশ লঙঘন করে ইচ্ছেমত ব্যবসা করার জন্য তিনি বিদেশী বণিকদের সমস্ত কুঠি ও বাণিজ্যকেন্দ্র বাজেয়াপ্ত করে নেন। পঁচিশ বছর শাসন করার পর তিনি অপরিমিত অর্থ সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরে যান।

ইব্রাহিম খাঁ ঃ শায়েস্তা খাঁর পর আসেন সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আত্মীয় খান-ই-জাহান, কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তাঁকে বরখাস্ত করে ইব্রাহিম খাঁকে সুবাদার করে বাংলায় পাঠান হয়।

শোভাসিংহ এবং রহিম খাঁর বিদ্রোহ ঃ ঔরঙ্গজেবের সুদীর্ঘ শাসনকালে একটি মাত্র বিদ্রোহ ও অশান্তির ঘটনা ছাড়া বাংলায় আর কোনও অশান্তি হয় নি। ইব্রাহিম খাঁর সময় এই বিদ্রোহ ঘটে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার জমিদার শোভাসিং বিদ্রোহী হন এবং তাঁর সঙ্গে উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খাঁ যোগদান করেন। তাঁদের সম্মিলিত শক্তির জোরে তাঁরা বর্ধমান ও হুগলী তাঁদের দখলে নিয়ে আসেন। কিন্তু বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার নীলতাহানির চেষ্টা করলে রাজকন্যা শোভাসিংহকে হত্যা করেন। শোভাসিংহের পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) হিম্মৎ সিংহ নেতা হলেও আসলে রহিম খাঁ হন বিদ্রোহীদের কর্তা। রহিম খাঁ রহিম শাহ্ নাম গ্রহণ করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। নানা জাতীয় লোকেদের নিয়ে দশ হাজার অশ্বারোহী এবং ষাট হাজার পদাতিকের এক বিরাট বাহিনী তিনি গড়ে তোলেন। এরপর তিনি মুকসুদাবাদ অভিযান করেন। ঐ শহরের সংলগ্ন স্থানের এক জায়গীরদার নিয়ামত খাঁ, নামান্তরে নিজামত খাঁ ভ্রাতুষ্পুত্র তহব্বর খাঁর সহযোগে রহিম খাঁকে বাধা দেন। কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। রহিম খাঁ মুকসুদাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং মালদহ ও রাজমহল অধিকার করেন। কাশিমবাজারের বিদেশী বণিকেরা বিস্তর উৎকোচ দিয়ে নিজেদের কুঠী গুলি রক্ষা করেন (১৬৯৬)। হিম্মৎ সিংহকে কাশিমবাজারে রেখে রহিম খাঁ আরও উত্তরে পদ্মা তীরবর্তী ভগবানগোলা অধিকারের উদ্যোগ করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছলে ঔরঙ্গজেব ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করে নিজ পৌত্র আজিম-উস্-সান্‌কে সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ দেন। জবরদস্ত খাঁ রহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং রাজমহল, মালদহ, মুকসুদাবাদ ও বর্ধমান পুনরাধিকার করেন। রহিম শাহ্ পুনরায় জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন (হিস্ট্রি অব্ মিডিয়েভ্যাল বেঙ্গল, ভলিউম-২, পৃঃ ৯৯)। কিন্তু দমন করা হলেও এই বিদ্রোহ বাংলায় মোগল শাসনের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিল। বিদোহের ফল হল সুদূরপ্রসারী। ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁদের বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সুরক্ষিত করার অনুমতি পান এবং এই সুযোগে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম এবং ওলন্দাজ ও ফরাসীরা চুঁচুড়া ও চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ করেন। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজরা এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন(মুর্শিদকুলি খাঁ এন্ড হিজ টাইমস্, পৃঃ ১-৩)।

আজিম-উস্-সান্ ঃ আজিম-উস্-সান্ ১৬৯৭-১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সুবাদার ছিলেন। তাঁর সময় দেওয়ান ছিলেন সম্রাটের প্রিয় পাত্র এবং অতি বিশ্বস্ত করতলব খাঁ (পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁ)। আকবরের সময় থেকেই দেওয়ান ছিলেন রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা এবং সুবেদারের অধঃস্তন কর্মচারী হলেও নিজের বিভাগে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। ঔরঙ্গজেব দেওয়ানকে আরও বেশি ক্ষমতা দেন। করতলব খাঁ (পূর্ব নাম মহম্মদ হাদী) বাংলায় আসার আগে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান ও ইয়েলকণ্ডলের ফৌজদার। তাঁর কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে করতলব খাঁ উপাধি দেওয়া হয়। বাংলায় একজন অত্যন্ত দক্ষ দেওয়ানের প্রয়োজন হওয়ায় ঔরঙ্গজেব তাঁকে বাংলার দেওয়ান ও মকসুদাবাদের ফৌজদার করে পাঠান। করতলব খাঁ ঢাকায় আসার পরেই রাজস্ব বিভাগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ফলে স্বয়ং সুবাদারের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বাধে এবং আজিম্-উস্-সান্ তাঁকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র করেন। করতলব খাঁ ঢাকায় থাকা নিরাপদ

মনে না করে দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি অনেক হিসাব কষেই মকসুদাবাদে তাঁর দপ্তর নিয়ে আসেন। একে মকসুদাবাদ কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অবস্থিত, তাছাড়া এখান থেকে প্রদেশের সর্বত্র তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারবেন। সর্বোপরি এই স্থানের ফৌজদার হওয়ায় তিনি অনেক বেশী শক্তি(র অধিকারী হবেন। এছাড়াও এখানে ভাগীরথীর তীরবর্তী বিদেশী বণিকদের কেন্দ্রগুলিতে সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হবে।

এই ঘটনায় সম্রাট ঔরঙ্গজেব আজিম-উস্-সানের উপরেই যারপরনাই ক্রু(দ্ধ হন এবং তাকে বিহারে চলে আসতে নির্দেশ দেন। সেই মত আজিম-উস্-সান্ পুত্র ফা(কশিয়ারকে ঢাকায় রেখে ঢাকা ত্যাগ করে পাটনায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ ঃ ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে দেওয়ানখানা স্থানান্তরিত করার পর করতলব খাঁ তাঁর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৎসরে রাজস্ব বিভাগের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে দা(ণাত্যে অবস্থানরত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হন। সম্রাট এবং এবং অমাত্যদের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থও উপহার হিসাবে অবশ্যই প্রদত্ত হল। সম্রাট তাঁর হিসাবপত্র দেখে এবং তাঁর দ(তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি ও নানারকম সম্মান ও খেতাব দান করলেন এবং নিজ নামানুসারে মখসুদাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ রাখার অনুমতি দিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই সম্ভবতঃ এপ্রিল/মে মাসে বাংলায় ফিরে আসার পর করতলব খাঁর নূতন নাম হল মুর্শিদকুলি খাঁ এবং মকসুদাবাদ পরিবর্তিত হল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদে একটি রাজকীয় টাকশালও স্থাপিত হল (আব্দুল করিম-মুর্শিদকুলি খাঁ অ্যান্ড হিজ টাইমস্, এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ পাকিস্তান, ১৯৬৫)।

এরপর মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার ইতিহাসে আরেকটি পর্বের সূচনা হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে বাংলার সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে তেমন পৃথক কিছু নয়। তবে আঞ্চলিক (ে ত্রে কিছু কিছু পার্থক্য থাকেই।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে অর্থাৎ তের থেকে ষোল শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ ছিল। এর কারণ এ সময়ে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যে বেশ উন্নতি ঘটে। এর রাজনৈতিক কারণ স্বাধীন সুলতানদের সময় বাংলার ধনসম্পদ বাংলাতেই থেকে যেত, বাংলার বাইরে যেত না। কিন্তু মোগল আমলে বাংলা দিল্লীর একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। সুতরাং সেই সময় দেশের সমৃদ্ধি থাকলেও বাংলা থেকে রাজস্ব হিসাবে দিল্লীর কেন্দ্রীয় কোষাগারে এই সম্পদের একটা বিরাট অংশই চলে যেত। মোগল আমলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে দেশ আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে দেশীয় বণিক সমাজ ছাড়াও ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিকেরা ব্যাপক শিল্প উৎপাদন ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে দেশে সমৃদ্ধি নিয়ে আসেন। নানারকম শিল্প বিশেষতঃ বস্ত্র শিল্প দেশে সম্প্রসারিত হয় এবং এই সকল শিল্পে বহু লোকের জীবিকা নির্বাহ হয়। বিভিন্ন বৈদেশিক বিবরণ এবং মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় বস্ত্রশিল্প ছাড়াও বাংলার নৌ-নির্মাণ শিল্প, শঙ্খ শিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার শিল্প প্রভৃতি যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং সেই সকল শিল্পজাত সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হত। কৃষিজ সামগ্রীতো ছিলই।

ষোড়শ শতকেই বালিঘাটা (বর্তমান রঘুনাথগঞ্জের উত্তরাংশ) একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে পরিগণিত ছিল। 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে ধনপতি সওদাগরের গৌড় যাত্রা প্রসঙ্গে বালিঘাটার উল্লেখ আছে। সতের শতকে বিখ্যাত ভ্রমণকারী সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক (১৬২৯-৪৩) বালিঘাটাকে একটি সমৃদ্ধ নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলকাব্যে নবদুর্গা-গোলাহাটেরও (বড়এ(া থানা) বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে উল্লেখ আছে। সৈদাবাদ, কালিকাপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বণিকদের বড় বড় কারখানা (Factory) স্থাপিত হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চলে প্রধানত রেশমশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে। অবশ্য এর আগে থেকেই এই সব স্থান রেশমবস্ত্র শিল্পে খ্যাতি লাভ করেছিল। রঘুনাথগঞ্জ থানায় মীর্জাপুর এবং বাগড়ী অঞ্চলে ইসলামপুরে রেশম বয়নশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রাঙামাটি (কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল), শক্তি(পুর, দাদপুর (বেলডাঙ্গা থানা), নগর (খড়গ্রাম), মহলন্দি (কান্দী থানা), পাঁচথুপি, মুনিয়াডিহি প্রভৃতি স্থানগুলিও রেশম উৎপাদন ও বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে খ্যাতি লাভ করে। ফরাক্কাবাদ (বর্তমান ফরাক্কার নিকটবর্তী, কিন্তু বর্তমানে লুপ্ত), ঔরঙ্গাবাদ (সুতি), জাহাঙ্গীরপুর (জঙ্গীপুর), গাঙ্গুরী (গণকর) ভগবানগোলা, বালুচর (জিয়াগঞ্জ), গোয়াস (রাণীনগর থানা) প্রভৃতি স্থানগুলিও মধ্যযুগেই বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়।

ধর্ম ও সমাজ ঃ এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চলটিতে

MURSHIDABAD 3RD # 101
21-9-2003

বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল প্রসার ছিল। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। কিন্তু তাঁরা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করায় ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মেরও রীতিমত প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ মহাযানী তান্ত্রিক আচারের সংমিশ্রণে এক মিশ্র তান্ত্রিক ধর্মমতের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত অজস্র হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন এই মিশ্র ধর্মমতের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। সেন আমলে (১১-১২ শতক) গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের বিরোধিতায় বর্ণভেদহীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত হয়ে পড়েন। ফলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ সেনরাজা এবং তাঁদের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মভিত্তিক সমাজের উপর (ব্ধ হয়ে পড়েন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুসলিম অধিকার এই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে আসে। (ব্ধ বৌদ্ধদের এক বিরাট অংশ বর্ণভেদহীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই জেলায়, বিশেষ করে জেলার উত্তর অঞ্চল ও বাগড়ী অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য এই ঘটনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে কর্ণসুবর্ণ উৎখনন-খ্যাত সুধীর রঞ্জন দাস মনে করেন (কর্ণসুবর্ণ মহানগরী, পৃঃ ২৬)। সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনে অনেকেই নানা কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ব্যপকভাবে ধর্মান্তরীকরণের এটাই প্রধান কারণ। মধ্যযুগে, বিশেষ কবে মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে বহু পীর, ফকির ও ধর্মপ্রচারকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভারতবর্ষের বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে এসেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব পীর, ফকির ও ধর্মপ্রচারকদের আস্তানা, মাজার, দরগা ছড়িয়ে আছে। অবশ্য রাঢ় অঞ্চলে এসবের সংখ্যা অনেক বেশী। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রা(সীডাঙ্গার (কর্ণসুবর্ণ) সংলগ্ন পীর তুরকান, গিয়াসাবাদে গিয়াসুদ্দীন পীর, রমনা সেখদীঘি গ্রামে আবু সৈয়দ তিরমিজ, সাগরদীঘি-সংলগ্ন সন্তোষপুরে বুড়াপীর ও ব্রাহ্মণীগ্রামে পীর বনোয়ারী বা বরবারী শাহ্, মোরগ্রাম-বোখারায় পীর বোখারী, সুতি থানায় বহুতালীতে মালিক দেওয়ান সাহেব, হা(য়াতে সৈয়দ মর্তুজা (মূল সমাধি ছাপঘাটিতে, কিন্তু সেটি ভাগীরথীগর্ভে বিলুপ্ত হলে এখানে একটি নকল সমাধি নির্মিত হয়েছে), রঘুনাথগঞ্জ থানার চরকায় রাজ্জাক শাহ্ ও জামাল শাহ্, গণকরে সত্যপীর, খড়গ্রাম থানায় খড়গ্রামে মখদুম পীর, নগরে শাহ্ চাঁদ ফকির (দাদাপীর নামেই অধিক পরিচিত), ভগবানগোলা থানায় দাতাপীর বা দাদাপীর, মুর্শিদাবাদ থানায় চুনাখালিতে পীর মসনদ আউলিয়া ও মখদুম শাহ্, রেজিনগর থানায় বাজারসাউতে বুড়োপীর, ফরিদপুরে (পলাশীর সামান্য উত্তরে) পীর ফরিদ শাহ্, বড়এ(া থানায় কুলীতে শাহ্ মহম্মদ আব্দুল জব্বার গুলি চিশতি নিজানি ও বাবরপুরে পীর শাহ্ আলমগীর বা মালিক পীর, কান্দী থানার মহলন্দীতে হজতরপীর, ভরতপুর থানায় জজানে দাদা আদম পীর প্রভৃতির দরগা।

গৌড়ীয় বৈষ(ব ধর্ম ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তাঁর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ(বধর্ম জনমানসকে উদ্বেলিত করে তোলে। এই ধর্মে জাতি-বর্ণভেদ না থাকায় যে সকল তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি তাঁরা প্রায় সকলেই চৈতন্য-প্রবর্তিত এই ধর্ম গ্রহণ করেন। অবশ্য কেবল সমাজের নিম্নস্তরের মানুষই নয়, সমাজের বহু উচ্চপদস্থ, উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণের মানুষও চৈতন্যের ভক্তি(ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৈষ(ব ধর্ম অবলম্বন করেন। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে তিনি মুর্শিদাবাদের কিছু অঞ্চল পরিত্র(মা করেছিলেন, এবং সেই সময় জেলায় দু-একটি বৈষ(বকেন্দ্র (শ্রীপাট) গড়ে উঠলেও চৈতন্যের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই খুব অল্পদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকেই সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় এই নূতন ধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়। এই ধর্মের প-াবনেই রাঢ় বাগড়ী একাকার হয়ে যায়। মুর্শিদাবাদ জেলায় এই ধর্মপ্রচারে প্রধান ভূমিকা শ্রীনিবাস আচার্য এবং নরোত্তম দাস (দত্ত)-এর। রাঢ় অঞ্চলে ভরতপুর, কাঞ্চনগড়িয়া, মালিহাটি, ঝামটপুর (বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং প্রশাসনিক দিক দিয়ে বর্ধমান জেলায়), মাড়গ্রাম (খড়গ্রাম থানা), বুধুইপাড়া (বহরমপুরের অপর পাড়ে) এবং বাগড়ী অঞ্চলে গাম্ভীলা (জিয়াগঞ্জ), বাহাদুরপুর (থানা জিয়াগঞ্জ), তেলিয়া বুধুরি (ভগবানগোলা থানা), গোয়াস ও বোরাকুলি (রাণীনগর থানা) ব্রহ্মপুর (সৈদাবাদ, বহরমপুর) প্রভৃতি স্থানে বৈষ(বকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে বৈষ(বধর্মের পাশাপাশি তান্ত্রিক শক্তি(উপাসনা এবং শাক্ত(সম্প্রদায়ের প্রভাব অন্ততঃ রাঢ় অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণেই থেকে যায়। এই অঞ্চলের সর্বত্র কালীস্থান এবং শক্তি(উপাসনার প্রভাব এখনও বর্তমান। শক্তি(উপাসনার প্রধান কেন্দ্রগুলি হল কিরীটে(ধরী (মুর্শিদাবাদ শহরের সন্নিকটে), জজান, কাগ্রাম, পাঁচথুপি, কান্দী, এড়োয়ালী (খড়গ্রাম থানা), গয়েশপুর(ঐ), গোর্ক্ষ, নবগ্রাম (কান্দী থানা), সিংহে(ধরী, গাদি (সাগরদীঘি থানা), গণকর, জ(র-বাড়ালা (রঘুনাথগঞ্জ) বংশবাটী, হিলোড়া (সুতি থানা) প্রভৃতি।

শি(া সাহিত্য সংস্কৃতি ঃ মুসলমান অধিকারের সময় দেশের পূর্বতন শি(া প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ করে বৌদ্ধ বিহারগুলি অধিকাংশই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই সব বিহারগুলি উচ্চ শি(ার কেন্দ্র ছিল। কেবল বৌদ্ধ শাস্ত্রই নয়, অন্যান্য বিষয় এবং ভাষা ও ধমচর্চারও কেন্দ্রস্থল ছিল এগুলি। ফলে ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও ব্যাহত হয়েছিল। তবে মুসলমান শাসকগণ প্রথম থেকেই মসজিদ এবং মক্তব, মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন করে ইস্লামিক শি(ার ব্যবস্থা করেন। প্রথমদিকে রাঢ় অঞ্চলের উত্তরাংশেই (জঙ্গীপুর মহকুমা অঞ্চল) মুসলমান অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। সেই জন্য প্রথমে এই অঞ্চলেই মসজিদের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম শি(া প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। গিয়াস্-উদ্-দীন ইউয়জ বহুসংখ্যক মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তার কিছু এই অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল, অন্ততঃ গণকর এবং গিয়াসাবাদে তো বটেই। তারপর ক্র(মশঃ চরকা, চাঁদপাড়া, ব্রাহ্মণীগ্রাম, মাসুফাবাদ (সেখদীঘি), বোখারা প্রভৃতি স্থানগুলিতেও যে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য। অবশ্য পূর্বতন সংস্কৃত শি(ার প্রচলনও যে ভালই ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বৈষ(ব ধর্মের ব্যাপক প্রসার এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বৈষ(ব কেন্দ্রগুলির এই শি(া প্রসারে বিরাট ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগের বহু পণ্ডিত এবং সাহিত্য স্রষ্টাদের আর্বিভাব এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মধ্যযুগে মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং উচ্চস্তরের কবির আর্বিভাব হয়েছে। আলোচ্য সময়কালে তাঁরা প্রায় সকলেই বৈষ(ব সাধক, কবি ও পদকর্তা। প্রখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রণেতা কৃষ(দাস কবিরাজের (জন্ম ও মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৪৯৬ ও ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রখ্যাত কবি এবং পণ্ডিত কৃষ(দাস মুর্শিদাবাদ সীমান্ত সংলগ্ন বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামের অধিবাসী হলেও তাঁর শ্রীপাট মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ 'গোবিন্দলীলামৃত', 'সারঙ্গরঙ্গদা', 'কৃষ(কর্ণামৃত'র টীকা প্রভৃতি। চৈতন্য পার্ষদ গদাধর গোস্বামীর শ্রীপাট ভরতপুরে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র (ষোড়শ শতক) একজন বৈষ(ব কবি। কাঞ্চনগড়িয়ার (ভরতপুর থানা) দ্বিজ হরিদাসের পুত্র গোকুলানন্দ (১৬-১৭ শতক) একজন বিশিষ্ট পদকর্তা। কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা ও পদকর্তা রামচন্দ্র সেন (১৫৩৬-১৬১০) এবং তাঁর সহোদর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ(ব কবি গোবিন্দ দাস (১৫৩৯-১৬২০) ভগবানগোলার সন্নিকটে তেলিয়া বুধুরির অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসের পৌত্র বলরাম দাসও খ্যাতনামা পণ্ডিত, সংস্কৃত গ্রন্থকার ও পদকর্তা। 'কর্ণামৃত' রচয়িতা ও পদকর্তা যদুনন্দন দাস ঠাকুরের (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক— জন্মস্থান মালিহাটি এবং বাসস্থান বুধুইপাড়া (বহরমপুর শহরের অপর পাড়ে)। আদিতে নদীয়া জেলার দেবগ্রামের অধিবাসী হলেও সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত, গ্রন্থকার ও পদকর্তা বি(্বনাথ চক্র(বর্তী (সতের শতক) তাঁর গু(গৃহ সৈদাবাদেই প্রায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর সাধনার স্থলও ছিল এখানেই। মুসলমান সাধক ও অন্যতম পদকর্তা সৈয়দ মর্তুজা (সতের শতক) জঙ্গীপুরের নিকটে ছাপঘাটির অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বৈষ(ব পদাবলীর জন্য তিনি বাংলার কবি সমাজে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সে কালে মুর্শিদাবাদে আরও অনেক কবি ও পদাবলী রচয়িতার আবির্ভাব হয়েছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ মুসলমান অধিকারের প্রথম দিকেই এই জেলায় বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন পীর ফকিরের সমাধিতে বেশ কিছু দরগাগৃহও নির্মিত হয়। পরবর্তীকালে এই সব দরগায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের সমাবেশ হতে থাকে , বিশেষ করে উৎসবের সময়। পরবর্তীকালে মোগল আমলে যথেষ্ট সংখ্যক মসজিদ, সমাধিস্থান, ইমারত ও অন্যান্য নির্মাণকার্য হয়েছে। সেই সময়ের অনেক কীর্তিই বর্তমানে লুপ্ত অথবা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেবল দু-একটি সংস্কৃত বা পুনর্নির্মিত হয়ে ডাল অবস্থায় আছে। তবে এগুলির অধিকাংশই নবাবী আমলে নির্মিত।

মসজিদ ঃ এ জেলায় প্রাচীনতম যে মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি নির্মিত হয় বাবরপুরে (সম্ভবতঃ সাগরদীঘি থানা) ৮৪৭ হিজরি বা ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু এখন সেটির অস্তিত্ব নাই। পাঠান আমলে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে একমাত্র খে(রের মসজিদটি আদি রূপ নিয়ে এখনও বর্তমান, যদিও সেটি ভগ্ন অবস্থায় কোন রকমে টিকে আছে। ৯০০ হিজরি বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মসজিদের স্থাপত্য এবং ভিতর ও বাহিরের পোড়ামাটির অলঙ্করণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী, গৌড়ের শ্রেষ্ঠ মসজিদ গুলির সঙ্গে তুলনীয়। এই আমলের আর একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় আতাই গ্রামে। এই আমলেই নির্মিত বহরমপুরের কারবালা মসজিদ (নির্মাণ কাল ৮৯৬ হিজরি বা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দ), এবং বড়এ(া থানায় বাহাদুরপুরের মসজিদের পূর্বরূপ আর নাই। মোগল আমলের প্রথম পর্বে নির্মিত মসজিদগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ কাশিম-নির্মিত বালিঘাটার জুম্মা মসজিদ (নির্মাণ কাল ১১৭৫ হিজরি বা ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দ)। খড়গ্রাম থানায় শেরপুরের সুদৃশ্য মসজিদটি

MURSHIDABAD 3RD # 103
21-9-2003

সম্রাট শাহজাহানের সময় নির্মিত। পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইন্দ্রাণীর মসজিদটিও এই সময়ে নির্মিত হলেও পুরানো মসজিদটি ধ্বংস হয়ে গেলে ঐ ভিত্তিরই উপর বর্তমান মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। পাঁচথুপির মোকামপাড়ার পুরাতন মসজিদটি শাহজাহান অথবা ঔরঙ্গজেবের সময় নির্মিত। গিয়াসাবাদের কাছে ভুঁইহাটে ঐ সময়ের একটি সুন্দর মসজিদ আছে।

দরগা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বিস্তর পীর ফকিরের সমাধিতে দরগা গৃহ নির্মিত হয়। কতকগুলি এখনও সগৌরবে বিরাজমান। অনেকগুলির ধ্বংসাবশেষ এখন দেখা যায়। প্রাচীনতম দরগাটি গিয়াসাবাদে অবস্থিত এবং সম্ভবতঃ তের শতকে নির্মিত ফকির গিয়াসুদ্দিন সাহেবের দরগা। এটি বহুবার সংস্কৃত হয়েছে। নিকটে চালতেবাড়ি গ্রামে আর একটি দরগা আছে। সাগরদীঘির পূর্ব পাড়ে সন্তোষপুরের বুড়োপীরের দরগা গৃহটি বর্তমানে অবলুপ্ত। চরকায় অবস্থিত রাজ্জাক শাহ্ বা রাজাক শাহ্-এর দরগা জেলায় বিখ্যাত। রাজ্জাক শাহ্ পীরের মাজার ও শিষ্য জামাল শাহ্ এর সমাধি এখানে অবস্থিত। গৃহটি নূতন করে নির্মিত হয়েছে। রজ্জাক শাহ ষোড়শ শতকে বর্তমান ছিলেন। গণকরের সত্য পীরতলাও সযত্নে রক্ষিত, তবে এখানে কোন গৃহ নির্মাণ করা হয়নি। খড়গ্রামের দরগাটিতেও কোন গৃহ নাই, তবে অনেক জায়গা নিয়ে অত্যন্ত মর্যদা সম্পন্ন এই দরগা। নগরে অবস্থিত বিখ্যাত দাদাপীরের দরগায় গৃহ মাটির, পূর্বে কোন ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল কিনা বলা যায় না। বড়এ(া থানায় বাবরপুরে পীর শাহ্ আলমগীর বা মল্লিক পীরের দর্শনীয় সমাধিটি সযত্নে রক্ষিত। এর উপরেও কোন গৃহ নাই। বাজারসাউতে অবস্থিত নাতিবৃহৎ দরগা গৃহটি একটি এক গম্বুজ মসজিদের মত। ভাগীরথীর পূর্বপাড়ে পলাশীর কিছুটা উত্তরে ফরিদপুরে একগম্বুজ গৃহটি যেমন প্রাচীন তেমনই সযত্নে রক্ষিত। বহরমপুরের নিকটবর্তী চুনাখালির গৃহটি অল্পদিন আগে নির্মিত, যদিও পীর মসনদ আউলিয়া সুলতানী আমলের লোক।

মন্দির ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু মন্দির নির্মিত হয়েছিল কিন্তু প্রাচীন কালের মন্দিরের এখন আর কোন অস্তিত্বই নাই। মধ্যযুগে স্বাভাবিক কারণেই মন্দির খুব কমই নির্মিত হয়েছে। এখন যে সকল মন্দির মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র দেখা যায় সেগুলি প্রায় সবই পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্তীকালে নির্মিত। আলোচ্য সময়ে নির্মিত প্রাচীনতম যে মন্দিরটির সন্ধান পাওয়া যায় সেটি কিরীটেশ্বরীতে অবস্থিত ছিল। এটির নির্মাণকাল ১৩৮৭ শক বা ১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি কিছুদিন আগে সম্পূর্ণরূপে বিধস্ত হয়ে গিয়েছে। গোকর্ণের নৃসিংহ বা নরসিংহ মন্দির ১৫০২ শক বা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি এখনও অটুট যদিও চুনকাম করার ফলে দেওয়ালের পোড়া মাটির কাজগুলির অনেকটাই (তি হয়েছে। এটি আদিম চারচালা মন্দিরের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মতিঝিলের পূর্বতীরে কুমারপাড়ায় রাধামাধবের দালান মন্দিরটি ষোল-সতের শতকে নির্মিত তবে কোনটিই তার পূর্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। অনেকবার সংস্কার হওয়ায় এই মন্দির দুটি আদিতে কেমন ছিল বলা কঠিন। এই সময়ে আর কোন মন্দির মুর্শিদাবাদ জেলায় নির্মিত হয়েছিল কিনা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

মুর্শিদকুলি খাঁর সময় জেলাঞ্চল ঃ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭২৭ - এ মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাঝের দুটি বছর বাদে (১৭০৮ ও ১৭০৯) মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদে থেকে অবশেষে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর মুর্শিদকুলি খাঁ হন সুবা বাংলার সুবাদার এবং তাঁর উপাধি হয় সুতামন-উল্ - মুল্ক আলা উদ্ দৌলা, জাফর খান বাহাদুর নাসির, নাসির জঙ্গ।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস শান্তি ও সমৃদ্ধির। ঢাকা থেকে মুর্শিদকুলি খাঁ এসেছেন মুর্শিদাবাদের কুলোরিয়ায়। তাঁর সঙ্গেই মহিমাপুরে এসেছেন রাজস্থানী ধনকুবের মাণিকচাঁদ, ডাহাপাড়ায় এসেছেন বঙ্গাধিকারী প্রথম কানুনগো দর্পনারায়ণ এবং ভট্টবাটীতে দ্বিতীয় কানুনগো রামজীবন রায়ের প্রপৌত্র জয়নারায়ণ। মুর্শিদাবাদ মহানগরী হয়ে উঠেছে জমজমাট।

অষ্টাদশ শতকের শু(তে মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। একদিকে যেমন ঢাকা থেকে দেওয়ানী দপ্তর তুলে আনেন মুর্শিদকুলি খাঁ, তেমনি আর একদিকে ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর ব্যবসা বাড়তে থাকে।

মুর্শিদাবাদে টাকশাল স্থাপন ঃ করতলব খাঁ যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদ নগরে তাঁর দেওয়ানী দপ্তর তুলে নিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন, তখনই জগৎশেঠ বংশের পূর্বপু(ষ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। মাণিকচাঁদ ছিলেন হীরানন্দের পুত্র। হীরানন্দের সাত ছেলে নানা স্থানে ব্যবসা করতেন। মাণিকচাঁদের ব্যবসা ছিল বাংলায়। এদের ছিল মূলতঃ মহাজনী ও হুন্ডির ব্যবসা।

মুর্শিদকুলি খাঁ দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি নিয়ে মুর্শিদাবাদে যে টাকশাল স্থাপন করেছিলেন , ঐ টাকশাল পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে মাণিকচাঁদের ওপর। জমিদারেরা যে টাকা রাজস্ব হিসাবে দেওয়ানকে জমা দিতেন, তার থেকে দিল্লীর সম্রাটের কাছে দেড় কোটি টাকা পাঠানো হত মানিকচাঁদের মাধ্যমে। ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফা(কশিয়ার মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন।

MURSHIDABAD 3RD # 104
21-9-2003

গ্রন্থপঞ্জী

কহলণ	রাজতরঙ্গিনী ঃ অ(য় কুমার দাস অনুদিত।
কৌটিলিয় অর্থশাস্ত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)	রাধা গৌবিন্দ বসাক।
নন্দী, সন্ধ্যাকর	রামচরিত ঃ সম্পাদনা রাধা গোবিন্দ বসাক।
ভট্ট, বাণ	হর্ষচরিত ঃ সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, নবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা।
কবিরাজ, কৃষ(দাস	চৈতন্য চরিতামৃত ঃ বসুমতী সংস্করণ, কলকাতা।
গুপ্ত, মৃণাল ঃ	রক্ত(মৃত্তিকা ঃ দেশ, ৪১ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৩৮০
গুপ্ত, সৌমেন্দ্র কুমার	চেনা মুর্শিদাবাদ ঃ অচেনা ইতিবৃত্ত, বহরমপুর।
ঘোষ, প্রদ্যোৎ ঃ	মালদহ জেলার পুরাকীর্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা ১৯৯৭।
ঘোষ, বিনয় ঃ	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ১ম ও ২য় খণ্ড, প্রকাশভবন, কলকাতা ১৯৭৬, ১৯৭৮।
চত্র(বর্তী, দেবকুমার ঃ	বীরভূম জেলার পুরাকৃর্তি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৭২।
চত্র(বর্তী মুকুন্দরাম	চণ্ডীমণ্ডল ঃ বসুমতী সংস্করণ, কলকাতা।
চত্র(বর্তী, রজনীকান্ত	গৌড়ের ইতিহাস ঃ মালদহ, ১৯০৯।
চন্দ, রমাপ্রসাদ	গৌড়রাজমালা ঃ রাজশাহী, ১৯১২।
দাশ, সুধীর রঞ্জন	কর্ণসুবর্ণ মহানগরী ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ১৯৯২।
দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ	বাংলার বৌদ্ধধর্ম ঃ কলকাতা, ১৩৫৫
বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল ও বক্সী, সত্যরঞ্জন	মুর্শিদাবাদের রাঢ় এলাকা ঃ স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, বহরমপুর।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস	বাংলার ইতিহাস (৩য় সং, ১ম ও ২য় খণ্ড) ঃ নবভারত প্রকাশনী, কলকাতা।
বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলিত ও প্রকাশিত)	বি(েকোষ, বি(েকোষ প্রেস, কলকাতা।
ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ	বৌদ্ধদের দেবদেবী ঃ বি(েভারতী, কলকাতা ১৩৬২।
মজুমদার, রমেশচন্দ্র	বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিসার্স কলকাতা।
মজুমদার, রমেশচন্দ্র	বঙ্গীয় কুল শাস্ত্র ঃ কলকাতা।
রায়, নিখিলনাথ	মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ঃ কলকাতা, ১৩০৯।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ	প্রাচীন বাংলার গৌরব ঃ বি(েভারতী।
সরকার, দীনেশচন্দ্র	(১) পালপূর্ব যুগের বংশচরিত ঃ কলকাতা, ১৯৮৫।
	(২) পাল ও সেন যুগের বংশচরিত ঃ কলকাতা, ১৯৮২।
সিংহ, শশাঙ্ক মোহন	শ্রী শ্রী বুধুরি বিলাস।
সেন, সুকুমার	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ)।

MURSHIDABAD 3RD # 105
21-9-2003

আবুল ফজল আলামি	আইন আকবরি, (টি. বাই ফ্রান্সিস, এড্ জগদীশ মুখোপাধ্যায়, ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন সোসাইটি, কলকাতা, ১৯৮৩।
বিল, এ.	১। লাইফ অব্ হিউয়েন সাং, লন্ডন, ১৯১১।
	২। সি-ইউ-কি, বুদ্ধিষ্ট রেকর্ড অব্ দি ওয়েষ্টার্ন ওয়ার্ল্ড, লন্ডন।
ভট্টাচারিয়া, বি-	ওয়েষ্টবেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ১৯৭৯, কলকাতা।
দাশ, সুধীর রঞ্জন	১। রাজবাদীডাঙ্গা ঃ দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৬৮
	২। আরকোলজিক্যাল ডিসকভারিস্ ফর্ম মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট- দি এশিয়াটিক সোসাইটি , কলকাতা-১৯৭১।
হান্টার, ডব্লু. ডব্লু.	স্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অব বেঙ্গল, ভলিউম-৯
কেন, পি. ভি.	নোটস্ অন হর্ষাচরিতা
করিম, আব্দুল	মুর্শিদকুলি খাঁ এন্ড হিজ টাইমস্ ঃ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ পাকিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৩।
কৃষ(নাথ কলেজ সেন্টিনারী কোমেমোরেশন্ ভলিউম ১৮৫৩-১৯৫৩ ঃ বহরমপুর ১৯৫৩।	
মজুমদার, আর. সি.	১। হিস্ট্রি অব্ অ্যানসিয়েন্ট বেঙ্গল ঃ জি, ভরদ্বাজ
	২। হিস্ট্রি অব্ মেডিয়েভল বেঙ্গল এ্যন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭১ এ্যান্ড ১৯৭৩
	এড. ৩। হিস্ট্রি এ্যান্ড কালচার অব্ ইন্ডিয়ান পিউপিল, ভলিউম ৩-৪, ভারতীয় বিদ্যাভবনর, বোম্বে।
মিত্র, অশোক (এড)	সেন্সাস-৫১, ওয়েষ্টবেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ
মুখার্জী, বি. বি.	ফাইনাল রিপোর্ট অন দি সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট অপারেশন ইন দি ডিষ্ট্রিক্ট অব মুর্শিদাবাদ, ১৯২৪-১৯৩২.
মুখার্জী, আর. কে.	হিন্দু সিভিলাইজেশন ঃ কলকাতা
ও' ম্যালি, এল. এস. এস.	বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, মুর্শিদাবাদ ১৯১৪
রায়, বি. বি.	সেন্সাস- ১৯৬১, ওয়েষ্টবেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, মুর্শিদাবাদ
সরকার, যদুনাথ (এড)	হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল, ভলিউম-২ (ঢাকা বি(বিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৪৮)
ওয়াটার্স, থমাস	অব হিউ-এন-সাং ট্রাভেলস্ ইন ইন্ডিয়া, ভলি-১,২) ঃ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি , লন্ডন, ১৯০৪.